দাম : ষোলো টাকা

‘ছাওয়া’ এক ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে — পৃঃ ২৪

স্বস্তিকা

নাগপুর হিংসায় জড়িত জেহাদিদেরই সমর্থন করছে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম — পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ৭ এপ্রিল, ২০২৫।। ২৪ চৈত্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

ছাওয়া

ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস নিষ্ঠুরতার।
সেকুলারদের রচনানৈপুণ্যে যে ইতিহাস
বিকৃতি ঘটেছিল ‘ছাওয়া’ তার মুখোশ খুলেছে।
আসল সত্য প্রকাশ্যে এনেছে।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ২৪ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৭ এপ্রিল - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

বিদেশের মাটিতে 'অপদস্থ' খেলায় চোরে চোরে মাসতুতো ভাই: মূর্খ তোতা ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

ইদ রাজনীতি চরমে হিন্দুত্বকে 'নোংরা' বললেন দিদি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

সোনিয়া গান্ধীর বিশ্বাসঘাতকতা : কেজিবি যোগ থেকে শুরু সোরোসের সঙ্গে যোগসাজশে ভারতকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা ☐ ৮

জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ : গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভর দায়িত্ব পালন করছে বিজেপি ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

নাগপুর হিংসায় জড়িত জেহাদিদেরই সমর্থন করছে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ১১

দ্বিশতাব্দীর দোরগোড়ায় পৌঁছানো ঐতিহ্যবাহী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ কেন উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ☐ ড. বিনয়ভূষণ দাশ ☐ ১৩

ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজের নির্মম হত্যার বদলা মরাঠারা কীভাবে নিয়েছিলেন? ☐ কানুরঞ্জন দেবনাথ ☐ ১৫

আন্দোলন ও নেতৃত্বের স্বরূপ ☐ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ☐ ১৮

'ছাওয়া'—এক নৃশংস নিষ্ঠুর ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন ☐ প্রবীর ভট্টাচার্য ☐ ২৩

'ছাওয়া' এক ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৪

সেবাধামের মূর্তপ্রতীক : বাবা কালীকমলিওয়ালা ☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ৩১

প্রত্যন্ত ত্রিপুরার কুল্লুক পূজা ☐ অসিত দাস ☐ ৩৪

বিশ্বের সামনে উদাহরণ সৃষ্টিকারী সমরস ও সংগঠিত ভারত নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সংকল্পবদ্ধ ☐ ৩৫

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ : দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্মান সংস্কার ও ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের ভারসাম্য ☐ রঙিন হালদার ☐ ৩৭

পশ্চিমবঙ্গ কি দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে চলেছে? ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ৩৯

ঔরঙ্গজেব-দ্বেষ : ভারতের স্ব-উপলব্ধির পুনরুদ্ধার ☐ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ☐ ৪৩

কয়েকটি সত্য কথার অবতারণা ☐ শিতাংশু গুহ ☐ ৪৭

এবারে শাসক দলের অন্দরেই কি বিদ্রোহের আগুন? ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ৪৮

গল্পকথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ চিঠিপত্র : ১৯ ☐ অঙ্গনা : ২০-২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯

প্রকাশিত হবে
১৪ এপ্রিল
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৪ এপ্রিল
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে সঙ্ঘ

পায়ে পায়ে শতবর্ষের দোরগোড়ায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে পরিচিত সঙ্ঘ। ভারতবর্ষকে পরম বৈভবসম্পন্ন করাই তার লক্ষ্য।

স্বস্তিকার বঙ্গীয় নববর্ষ সংখ্যায় সঙ্ঘের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখবেন কয়েকজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ কার্যকর্তা। থাকবে প্রয়াত কয়েকজন কার্যকর্তার লেখাও।

দাম একই থাকছে — ১৬ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ সূচনা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একশত বছরে স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে যথাক্রমে আগামী ১২, ১৩ ও ২০ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। প্রচার প্রতিনিধিদের নিজের নিজের প্রান্তের নির্দিষ্ট বৈঠকে পুরো সময় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা
যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
৮৬৯৭৭৩৫২১৪

দক্ষিণবঙ্গের বৈঠক ১২ এপ্রিল, ২০২৫, শনিবার, সকাল ১০টা

স্থান : আস্থা চিলড্রেন্স অডিটোরিয়াম অরবিন্দ সরণি, হাতিবাগান, কলকাতা-৬

মধ্যবঙ্গের বৈঠক ১৩ এপ্রিল, ২০২৫, রবিবার, সকাল ১০টা

স্থান : ছাই রোড, ভারতমাতা মন্দির
সঙ্ঘ কার্যালয়, ধাধকা নর্থ পুলিশ স্টেশন, আসানসোল

উত্তরবঙ্গের বৈঠক ২০ এপ্রিল, ২০২৫, রবিবার, সকাল ১০টা

স্থান : মাধব ভবন, ৩৯, বলাই দাস চ্যাটার্জি রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ঐতিহাসিক সত্য রুধিবে কে?

অন্যান্য জাতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনষ্ট ও বিলুপ্ত করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার মানসিকতা আব্রাহামিক ও সেমেটিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। ইহা করিবার জন্য তাহারা হেন কুকর্ম নাই যাহা করিয়াছে। বিশ্বের বহু উন্নত সভ্যতাকে তাহারা চিরতরে বিলীন করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তাহারা ইহা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বহু শতাব্দীব্যাপী অত্যাচার, নিপীড়ন, ধর্মান্তরণ, মঠ-মন্দির চূর্ণ করিয়া ভারতবর্ষের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। তাহার পরেও তাহারা ভারতবর্ষকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের প্রাণশক্তির নাগাল তাহারা পায় নাই। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে টমাস ব্যবিংটন মেকলে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তিকে অনুধাবন করিয়া তাহা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার সুপারিশে ইংরাজ শাসক এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে যাহাতে ভারতীয়রা শুধুমাত্র গাত্রবর্ণে ভারতীয় থাকিবে; আচারে-বিচারে, চিন্তায়-মননে তাহারা সাহেব হইয়া যাইবে। তাহারা তাহাদিগের উন্নত ঐতিহ্য ও পরম্পরার সমস্ত কিছুই বিস্মৃত হইয়া যাইবে শুধু নহে, ভারতবর্ষের যাহা কিছু উন্নত ও গরিমাময়, তাহাকে ঘৃণা করিতে শিখিবে। ইহার জন্য ইংরাজ শাসক সর্বপ্রথম শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাইয়াছে। ব্রিটিশ-ভারতে ইতিহাস পুস্তকের পাঠ্যবিষয় অবলোকন করিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিভিন্ন নিবন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতে প্রকৃত ইতিহাসের পুনর্লিখন হয় নাই। বরং ইতিহাস লিখনের ন্যায় গুরুদায়িত্বটি মার্কস ও মেকলেপুত্রদের হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে। তাহার ফলে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকসমূহে দেশের কথা নহে, বিদেশের গৌরবগাথায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকবাহিনী এই কার্যটি আরও সুচারুরূপে করিয়াছে। তাহারা আক্রমণকারী ইসলামি অত্যাচারের নৃশংস ঘটনাগুলি আড়াল করিয়া তাহাদের কীর্তিকলাপকে মহান করিয়া দেখাইয়াছে। কয়েক প্রজন্ম ধরিয়া এই মিথ্যা ইতিহাস অধ্যয়নের ফলে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও স্বাভিমানী ভারতীয় জাতি নির্মাণ হইতে পারে নাই। মেকলে সাহেব তো ইহাই চাহিয়াছিলেন! রাষ্ট্রভক্ত ঐতিহাসিকগণ মাঝে মধ্যে সত্য তথা প্রকৃত ইতিহাস তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেই মেকলেপুত্ররা ইতিহাসের গৈরিকীকরণ হইতেছে বলিয়া চিলচিৎকার শুরু করিয়াছে। তাহাদের চিৎকারে যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ প্রকৃত ঐতিহাসিকগণ চাপা পড়িয়া গিয়াছেন। সেই সুযোগে ভারত-ইতিহাসে নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের। কিন্তু ইতিহাস হইল অতীতের অধ্যয়ন। ইতিহাস তো 'জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া, পিতামহদের কাহিনি লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া'— তাহাকে চাপা রাখিবে সাধ্য কাহার?

ইতিহাস নানাভাবে ফিরিয়া আসে। কাব্যে-কবিতায়-লোকসাহিত্যে-নাটকে-চলচ্চিত্রে। সম্প্রতি একের-পর-এক যখন প্রকৃত ইতিহাস চলচ্চিত্রের পর্দায় ফুটিয়া উঠিতেছে, মার্কস-মেকলেপুত্র সেকু-মাকুর দল তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ চিৎকার শুরু করিয়াছে। তাহাদের বহু বৎসরের লালিত বিকৃত ও ভ্রান্ত ন্যারেটিভের কবর রচিত হইতে শুরু করিয়াছে। এই চিৎকার শুধুমাত্র ভারতের সেকু-মাকুরাই করিতেছে তাহা নহে, ভারত বিদ্বেষী পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমেও এই চিৎকার শোনা যাইতেছে। তাহাদের এই চিৎকার ক্রমশ আর্তচিৎকারে পরিণত হইবে। কারণ বর্তমানে ভারত শাসনের দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রভক্তদিগের হস্তে। তাহাদিগের কারণেই ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন ঘটিতেছে। তাহা প্রকৃত ও সত্য ইতিহাসের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করিতেছেন, বর্তমান ভারত দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে। একটি রাষ্ট্রভক্ত, অন্যটি রাষ্ট্রবিরোধী। সুখের বিষয় যে গরিষ্ঠাংশ ভারতবাসী রাষ্ট্রীয়তার পক্ষে রহিয়াছেন। রাষ্ট্রবিরোধীরা নগণ্য। তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছে দেশি বিদেশি দেশবিরোধী, মানবতা বিরোধী, সর্বোপরি জেহাদিশক্তি। সমগ্র বিশ্ব অবলোকন করিতেছে, ভারতে কাহাদের আইকন তৈমুর লং, ঘোরি, আকবর, ঔরঙ্গজেব? আর কাহাদের আইকন শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ মহামানব এবং গুরুগোবিন্দ, রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, ছত্রপতি শম্ভাজী প্রমুখ বীর যোদ্ধা? ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস মৃত্যুঞ্জয়ী। তাহাকে বিকৃত অথবা চাপিয়া রাখিবার সাধ্য মার্কস-মেকলেপুত্রদের নাই। তাহার উন্মোচনের কাল শুরু হইয়াছে।

সুভাষিতম্

জীবন্তু মে শত্রুগণাঃ সদৈব যেষাং প্রসাদাৎ সুবিক্ষণোহম্।
যদা যদা মে বিকৃতিং লভন্তে তদা তদা মাং প্রতিবোধয়ন্তি।।

আমার শত্রুরা সর্বদা বেঁচে থাকুক, তাদের কৃপায় আমি সচেতন থাকি। যখন যখন আমার মধ্যে কোনোরকম বিকৃতি আসে, তখন তখন তারা আমাকে সতর্ক করে থাকে।

বিদেশের মাটিতে 'অপদস্থ' খেলায় চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

মূর্খ তোতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কবির কথা ধার করে এই মূর্খ তোতাদের কাহিনি। কবির পাখি ছিল মহামূর্খ আর এই পাখিগুলি অত্যাচারী, মহাচোর আর মিথ্যাবাদী। পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের বেশি ভোটার আনুমানিক অর্ধশতক ধরে পাখিদের দেওয়া ছোলার ধোঁকা খাচ্ছেন। পাখিদের লক্ষ্য জীবিকার্থে অনৃতভাষণম্। জীবিকার জন্য মিথ্যা অশাস্ত্রীয়। সম্প্রতি বিদেশের মাটিতে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ সেজে একদল চোর অন্য চোরের দলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে ধরা পড়ে গিয়েছে। প্রতিবাদের নামে তারা যে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন একটি ছবির ভিতর দিয়েই সে ফোঁকর ধরা পড়ে গিয়েছে। সে তঞ্চকতা বেশি করে ধরা পড়ে যায় যখন কোনো মাহাত্ম্যে পাগল হঠাৎ শান্ত যোগীবর সেজে যান। পুরস্কার তিরস্কার করেছি কণ্ঠহার।

কয়েক বছর আগে এক ছাত্রীর প্রশ্নে তার ক্রোধ অনেকেই দেখেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাগ বওয়া কিছু লেখক আর স্তাবক এই ধৈর্য আর স্থিতধী ভাবের প্রশংসা করেছে। কবি বলেছিলেন 'ও ভাই কানাই কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ। তিনটে চারটে পাশ করেছি নই নিতান্ত মুক্‌খ (মূর্খ)।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ কারণেই অপদস্থ হয়েছেন। এর জন্য দায়ী তিনি। যে বা যারা তাকে অপদস্থ করেছে তাদের সেই সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন। চোদ্দ বছর ধরে মমতার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ আর কুকীর্তির সাজি তৈরি হয়েছে ভোটে জিতে তা যথার্থ নয় বলে মমতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এটা বোঝেননি পাপের ঘড়া উপচে পড়ছে। তারই ফসল বিদেশের মাটিতে দেশছাড়া লোকের হাতে অপদস্থ হওয়া। মুখের উপর তাঁরা মমতাকে মিথ্যাবাদী আর গণতন্ত্র বিরোধী বলেছেন। অবস্থার বিচারে সে সাহসটুকু মমতাই জুগিয়েছেন।

রেলমন্ত্রী থাকার সময় লালুপ্রসাদ যাদব একটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করে দাবি করেছিলেন রেলের ভাঁড়ারে তিনি ২০ হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রেখেছেন। পরে ভুসি কেলেঙ্কারিতে লালুর চুরি প্রমাণ হলে তাঁর জেল হয়। জানা যায় রেল কোষও ফাঁকা। আপাতত মমতার সেই হাল নয়। তবে সেদিকে যে এগোচ্ছে না তা বলা যায় না। মমতা অপদস্থ হয়েছেন নিজের দোষে।

এটা বিশ্বজনীন ধারণা যে, ভারতের বামপন্থীদের বোধশক্তি খুব দুর্বল। আর বিদেশের মাটি থেকে তা সঞ্জাত বলে সে অপদার্থতা আরও গভীর। অপাঙ্‌ক্তেয় এই বামকুলের কিছু বিদেশি শৌখিনদার মমতাকে অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে অপদস্থ করেছে বলে দাবি। মজার ব্যাপার, মমতা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি যে কোনো বলে ছক্কা হাঁকাতে পারেন। তাহলে আর তাঁর বশংবদদের এত হাঁকাহাঁকি কেন? মমতা নিজের সুনাম আর সুকীর্তিকে সাফল্যের সঙ্গে দুর্নাম আর কুকীর্তিতে পালটে দিয়েছেন। বিদেশের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মমতাকে নিয়ে

মমতা শিক্ষাবিদ নন। তবে রাজ্যে নারীশক্তির উত্থান নিয়ে কথা বলতে গেলে তাঁকে যে 'অভয়া কাণ্ড' নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন শুনতে হবে সেটা স্বাভাবিক। শিল্প নিয়ে মিথ্যা বললে প্রতিবাদ হবে এটাও ঠিক।

চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ তার নাম জানে না অথচ তাঁর স্তাবকরা তা নিয়ে অহেতুক ঢক্কানিনাদ শুরু করেছিল। এই ধরনের অগভীর চিন্তাই আজ বাঙ্গালি জাতিকে তার শিক্ষা সংস্কৃতির মন্দির থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়া নিয়ে যে ধরনের আদেখলাপনা দেখা গেল তাতে বাঙ্গালি হিসেবে মাথা হেঁট হয়ে যায়। এসব দেখে ভুলে যেতে হয় যে, আমাদের বরেণ্য পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। দু'জনেই বিদেশের অতি উচ্চ ডিগ্রি আর চাকরি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা হয়ে উঠেছিলেন।

বেশিরভাগ রাজনীতিবিদের মতো মমতাও ক্ষমতালোভী। সেই ক্ষমতার লোভ যেমন তাকে দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়েছে, তেমনই ভুলিয়ে দিয়েছে এই ধরনের অকেজো কলেজি অভ্যর্থনাতে কেন সাড়া দেওয়া উচিত নয়।

কংগ্রেসি ঘরানায় তৈরি মমতা ক্ষমতা ভুলতে শেখেননি। যারা তাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন তার মতো তারাও আজ সমানভাবে কলঙ্কিত। এটা রাজ্যের বদনাম নয়। মমতার একার দায়। তাই এখন অনেকেই দাবি করছেন মমতার হাতে রাজ্য সুরক্ষিত নয়। মমতা শিক্ষাবিদ নন। তবে রাজ্যে নারীশক্তির উত্থান নিয়ে কথা বলতে গেলে তাঁকে যে 'অভয়া কাণ্ড' নিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন শুনতে হবে সেটা স্বাভাবিক। শিল্প নিয়ে মিথ্যা বললে প্রতিবাদ হবে সেটাও ঠিক। তবে কারা করছে তা নিয়ে সন্দেহ থেকে গেল। কবিগুরুর মূর্খ পাখির মাথায় রাশি রাশি পুঁথি ছিল। আর এই পাখিদের মাথায় খালি চুরি আর মিথ্যার বেসাতি। তাই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ইদ রাজনীতি চরমে
হিন্দুত্বকে 'নোংরা' বললেন দিদি

ইসলামেযু দিদি,

ইদের মঞ্চ থেকে ভোটের প্রচার আপনি অনেক করেছেন। গত বছর সরাসরি ভোট চেয়েছিলেন। পেয়েওছিলেন। আর এবার সেই ইদের জমায়েতের মঞ্চ থেকেই দিদি আপনি এটা কী বললেন? যা শুনে আমি 'ইসলামেযু' বলে সম্বোধন করে ফেললাম। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'ব্যবহার' করছেন অনেক কিন্তু হিন্দুধর্মকে নোংরা (গন্ধা) বলে দেবেন ভাবিনি।

রেড রোডের ইদের অনুষ্ঠান-মঞ্চ থেকে সোমবার বিজেপির নাম না-করে তাদের আমদানি করা ধর্ম তিনি মানেন না বলেছেন। এই সূত্রেই 'নোংরা' শব্দটি ব্যবহার করে আপনি হিন্দু ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। যদিও আপনি যুক্তি দিতে পারেন নাম করে কিছু তো বলেননি। তবে দিদি, আপনার নাতনিকেও প্রশ্ন করে দেখুন সেও সঠিকটাই বুঝেছে। আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস স্বাভাবিক ভাবেই পুরো বিষয়টিকেই বিজেপির 'বিকৃত অপপ্রচার' বলে দাবি করছে। কিন্তু আপনার দলের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা মনে মনে কষ্টাই পাচ্ছেন। এমনকী অনেক মুসলমানও বলেছেন, তাঁদের খুশি করতে অন্যের ধর্মকে কথা বলছেন? সনাতন হিন্দু ধর্ম? ইদের দিনে এটা কী ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্য। কেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরির লক্ষ্যে এমন ঘৃণা ছড়াচ্ছেন আপনি? ধর্মকে 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করলে তা 'বুমেরাং' হবে কিন্তু। এই যে মালদহের মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদের সারগাছি উত্তপ্ত সে দায় তো রাজ্যের প্রধান হিসেবে আপনারই। সেই আগুনে আবার ঘি ঢালতে গেলেন কেন বলুন তো। ভোটের জন্য বিধানসভায় নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে আবার ইদের মঞ্চ থেকে সেই ধর্মকেই আঘাত কেন দিদি? একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্য অপর ধর্মকে আঘাত করা কি ঠিক দিদি?

হিন্দুধর্মকে 'আক্রমণ করে মমতা আনন্দ পান' বলে সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সনাতন ধর্মই কি 'নোংরা ধর্ম'? তিনি হিন্দুদের বিদ্রূপ ও তাঁদের ধর্মকে অপমান করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। হিন্দুদের 'টার্গেট' করতে তিনি আবার খোলা ছাড় দিচ্ছেন।'

মালদহের মোথাবাড়িতে অশান্তির জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে ফের 'উসকানি'র অভিযোগ তুলেছেন সুকান্তবাবু। সেই সঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে 'জয় শ্রীরাম' বলে গেরুয়া ফেট্টি পরে রামনবমীর মিছিলে হাঁটার আহ্বানও জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি! বুঝতে পারছেন দিদি, কেমন ভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনৈতিক আবহ। বড়ো কিছু হলে তার দায় কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে।

সোনিয়া গান্ধীর বিশ্বাসঘাতকতা

কেজিবি যোগ থেকে শুরু, সোরোসের সঙ্গে যোগসাজশে ভারতকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা

সোনিয়া গান্ধীর কেজিবি যোগের বিষয়টি বহুচর্চিত। কেজিবি-র সঙ্গে তার এই গোপন সম্পর্ক থেকে শুরু করে জর্জ সোরোসের সঙ্গে তার যোগসাজশ পর্যন্ত সোনিয়া গান্ধীর যাবতীয় কার্যকলাপ হলো ভারতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পটভূমিকে দুর্বল করার এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করার লক্ষ্যে একটি ক্যালকুলেটেড মিশন বা পরিকল্পনামাফিক প্রয়াস। নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ এবং ভারতে বিদেশি প্রভাবের বিস্তারের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের মূলে কুঠারাঘাত এবং হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা করেন সোনিয়া।

সোনিয়া গান্ধী এমনই এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি তার স্বামীকে হারানোর পর আবেগমথিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার রাজীবকে ফিরিয়ে দিলে আমি ফিরে আসব। যদি তোমরা তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে না পারো, তাহলে আমাকে মাটিতে মিশে যেতে দাও।' রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর প্রকাশ্যে এই ধরনের বিবৃতি দিলেও বাস্তবে সেই সময় থেকেই তিনি একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছেন, যা ভারতকে ভেতর থেকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করেছে। রাশিয়ান গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি সংযোগ থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিকতাবাদী জর্জ সোরোসের সঙ্গে গভীর যোগসাজশ ছাড়াও বছরের পর বছর ব্যাপী সোনিয়া গান্ধীর কার্যকলাপে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি হয় ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত।

২০০৪ সালে ভারতের ক্ষমতাকেন্দ্রে সোনিয়া গান্ধীর উত্থানের মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। পট পরিবর্তনের ফলে ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নেয়। পরিকল্পনামাফিক নেওয়া হতে থাকে একের পর এক পদক্ষেপ। তার মধ্যে ছিল— হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতিসাধন, দেশজুড়ে ব্যাপক ধর্মান্তরণ, জাতীয় নিরাপত্তার ওপর একের পর এক আঘাত এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ বেড়ে যাওয়া। হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল তার মধ্যে সহজতর টার্গেট। রাষ্ট্রবিরোধীদের শিকড় ছিল দেশের অনেক গভীরে প্রোথিত। একটি আপোশকামী মিডিয়া ইকোসিস্টেম এবং জাতীয় স্বার্থের বিপরীতধর্মী কাজকর্মে লিপ্ত আমলাতান্ত্রিক নেটওয়ার্কের সহায়তায় বিভাজন, প্রতারণা ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের নানা নজির রেখে গিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী।

১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধী নিহত হন। তার হত্যাকাণ্ডের আগে কংগ্রেস দল ও ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার উপর সোনিয়ার নিয়ন্ত্রণ ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে শিথিল। ওই বছর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হন পিভি নরসিমা রাও। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সোনিয়া ছিলেন ক্ষমতাবৃত্তের বাইরে। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তাঁর শাসনামলেও সোনিয়া ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক। ২০০৪ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সোনিয়া গান্ধী হয়ে ওঠেন চূড়ান্ত প্রভাবশালী। তার কয়েক দশকের পুরনো মিশনটি ধীরে ধীরে, সুচারুভাবে বাস্তবায়িত হতে শুরু করে।

কেজিবি যোগ : বিদেশি শক্তির সঙ্গে সোনিয়ার লিপ্ত থাকার অভিযোগ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমেরিকা-সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে শুরু হয় কোল্ড ওয়ার বা ঠাণ্ডা লড়াই। সেই আমলের সোভিয়েত গোয়েন্দা নথি থেকে জানা যায় যে, কংগ্রেস দলের সঙ্গে কেজিবি-র গোপন সম্পর্ক ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে তখন সোনিয়া গান্ধীও ছিলেন। গোয়েন্দা রিপোর্টটি প্রকাশ্যে আসার পর জানা যায় যে, অফশোর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কংগ্রেসকে অর্থপ্রেরণ করত কেজিবি। এই তহবিলটির নিয়ন্ত্রণ ছিল রাজীব ও সোনিয়ার হাতে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে এই সম্পর্কে সাময়িকভাবে ছেদ পড়ে। ২০০৪ সালে কেন্দ্রে সোনিয়ার উত্থানের ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পুনরায় বিস্তৃত হতে থাকে বিদেশি প্রভাব।

হিন্দুধর্মের উপর আঘাত : ভারতীয় সত্তাকে ধ্বংসের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা : ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকার সংসদে পাশ করায় ৯৩তম সংবিধান সংশোধনী। এই সংশোধনীটি ছিল হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলির উপর একটি সরাসরি আঘাত। সোনিয়ার চাপে ইউপিএ সরকার এই ৯৩তম সংবিধান সংশোধনীটি আনে। এই আইনের বলে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে যায় স্বশাসিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত। সংশোধনীর আওতার বাইরে তাদের রাখা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তপশিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য এই আইন প্রণীত হয়েছে বলে সরকারি তরফে দাবি করা হলেও এটি ছিল তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের ধর্মচ্যুত করার একটি কৌশল; হিন্দুধর্মের মূল স্রোত হতে তাদের বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। ব্রিটিশ আমলের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' (বিভাজন ও শাসন) নীতির হুবহু অনুকরণ ছিল ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী নির্দেশিত এই পন্থা।

শিক্ষার অধিকার আইনের মাধ্যমে ইউপিএ আমলে হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়া : ২০০৯ সালে ইউপিএ সরকার প্রণীত শিক্ষার অধিকার আইনটি হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলিকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য ২৫ শতাংশ সংরক্ষণ এই আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি যথারীতি এই আইনের আওতার বাইরে

থাকে। এর ফলে, হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেকগুলি স্কুল বন্ধও হয়ে যায়। এর বিপ্রতীপে খ্রিস্টান মিশনারি এবং ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি লাভ করে সরকারি সুরক্ষাকবচ। বিদেশি অর্থসাহায্যে তাদের তহবিল রীতিমতো ফুলেফেঁপে ওঠে। ইউপিএ সরকারের করাল গ্রাস হতে স্কুলের প্রার্থনাও বাদ পড়েনি। ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রার্থনা থেকে 'অসতো মা সদ্গময়' অংশটি বাদ দেওয়ার জন্য একটি আবেদন জমা পড়ে। ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার লক্ষ্যে সোনিয়া গান্ধীর একটি পরোক্ষ প্রয়াস। ইউপিএ শাসনামলেই দূরদর্শনের লোগো থেকে বাদ পড়ে 'সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্'। এটি ছিল জাতীয় প্রচারমাধ্যমের সাংস্কৃতিক আদর্শকে মুছে ফেলার একটি প্রচেষ্টা।

বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের তরফে নানা দাবির উত্থান : হিন্দুধর্মকে ভিতর থেকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা : শিক্ষাক্ষেত্রে আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থেকে রক্ষাকবচ পাওয়ার জন্য হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় পৃথক ধর্মের স্বীকৃতি আদায়ে সচেষ্ট হয়। কর্ণাটকের লিঙ্গায়েত ও সাঁইবাবার ভক্তমণ্ডলীর মতো একাধিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় পৃথক ধর্ম হিসেবে তাদের স্বীকৃতির দাবি জানাতে শুরু করে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক পাশাখেলার একটি চাল ছিল হিন্দুধর্মের মধ্যে এই বিভাজন সৃষ্টি। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে এই বিভাজনের রাজনীতির দ্বারা তারা শিখ, জৈন ও বৌদ্ধদের হিন্দুধর্ম হতে সরকারিভাবে পৃথক করেছিল। সোনিয়ার আসল লক্ষ্য ছিল হিন্দুসমাজকে খণ্ডিত করা, যাতে বিপুল গতিতে চলতে পারে ধর্মান্তরণ এবং বিদেশি প্রভাবের শিকড় ভারতের অনেক গভীরে হয় প্রোথিত।

রামসেতু সংক্রান্ত হলফনামা : সোনিয়া গান্ধীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা দায়ের করে। এই হলফনামায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয় যে, ভগবান শ্রীরাম, মা সীতা ও শ্রীহনুমান হলেন 'কাল্পনিক চরিত্র', তাই রাম সেতুর কোনো ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। সরকারি এই হলফনামা ছিল হিন্দু বিশ্বাস ও আস্থার উপর সরাসরি আক্রমণ। এর প্রতিবাদে বিরোধী দল বিজেপি-র সমগ্র দেশব্যাপী বিক্ষোভ-আন্দোলনের পর সরকার তার অবস্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়।

'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' : একটি ভয়ংকর ষড়যন্ত্র : ২০০৬ সালের আগে বিশ্ব কখনো 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি শোনেনি। মালেগাঁও ও সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণের ঘটনার পরে সোনিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউপিএ সরকার বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। সরকারের তরফে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনকে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক ইত্যাদি বলে প্রচার করা শুরু হয়। সরকারের তরফে দায়ের হওয়া ভুয়ো মামলাগুলির সবকটিই আদালতে খারিজ হয়ে যায়। সব অভিযোগই প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় সরকার। এই মামলাগুলি দায়ের করার মাধ্যমে তৎকালীন শাসক দল কংগ্রেস তাদের লক্ষ্যে আংশিকভাবে সফল হয়। এই হিন্দুবিরোধী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামপন্থী, জেহাদি, সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হিন্দু সংগঠনগুলিকে একাসনে বসানোর চেষ্টা করে সোনিয়ার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস। প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তারা এক ও সমার্থক।

জাতীয় নিরাপত্তার উপর আঘাত : ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিভাজনের বীজ বপন : সোনিয়া পরিচালিত ইউপিএ-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিপজ্জনক পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ধর্ম ও মতের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিভাজনের প্রচেষ্টা। সরকারের হাতিয়ার ছিল সাচার কমিটির রিপোর্ট। এই রিপোর্টে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের সংখ্যা নির্ধারণে একটি সমীক্ষার সুপারিশ করা হয়। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির লক্ষ্যে চলছিল এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। রাষ্ট্রবাদী শক্তির প্রতিবাদ-প্রতিরোধে এই পরিকল্পনাটি বাতিল করতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু এর মাধ্যমে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করার লক্ষ্যে কংগ্রেসি ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ্যে চলে আসে।

মন্দিরগুলিকে লুঠের মাধ্যমে গির্জাগুলিকে অর্থসাহায্য : তথ্য জানার অধিকার আইনের বলে দায়ের হওয়া আবেদনের ভিত্তিতে প্রদত্ত সরকারি নথিতে প্রকাশিত হয়েছে যে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারগুলি, বিশেষ করে কর্ণাটক সরকার গির্জাগুলির জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। হিন্দু মন্দিরগুলির উপর বলবৎ ছিল কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ। সেই মন্দিরগুলির উপর চলে সরকারি শোষণ। এই সরকারি বৈষম্যের ফলে ধর্মান্তরণ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এর সঙ্গে ঢালাও বিদেশি অর্থসাহায্যের রাস্তা খুলে দেওয়ায় দেশজুড়ে ইভাঞ্জেলিকাল কার্যকলাপও হয় বেলাগাম।

কাঞ্চী শঙ্করাচার্যের গ্রেপ্তার : ২০০৪ সালে দীপাবলীর রাতে কাঞ্চী শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতীকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রথমে এই গ্রেপ্তারিকে তামিলনাড়ুর জয়ললিতা সরকারের পদক্ষেপ বলে মনে করেছিল রাজনৈতিক মহল। কিন্তু প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় পরে আসল সত্য সামনে আনেন। তিনি বলেন যে, সোনিয়া গান্ধীর নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ছিল এই গ্রেপ্তারি। খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মান্তরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি বড়ো বাধা হয়ে উঠেছিলেন শঙ্করাচার্য।

জর্জ সোরোস সংযোগ : বিদেশি প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতকে অশান্ত ও অস্থির করে তোলার প্রচেষ্টা : ভারত বিদ্বেষী, মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরোস এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ফোরাম অফ ডেমোক্র্যাটিক লিডার্সের সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর সম্পর্কের বিষয়টি সম্প্রতি সামনে এসেছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন নথিপত্রে সোনিয়া গান্ধী, রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন এবং জর্জ সোরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের মধ্যে থাকা সম্পর্কটি উন্মোচনের মাধ্যমে ভারত বিরোধী বিভিন্ন বিদেশি শক্তির সঙ্গে সোনিয়ার যোগাযোগের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিশ্ব ঔপনিবেশিকতার প্রতিভূ জর্জ সোরোস প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, নরেন্দ্র মোদীকে ভারতের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়াই তার লক্ষ্য। ভারতবিরোধী কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাপকভাবে আর্থিক মদত দিয়ে চলেছেন। সোরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সলিল শেঠি রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। নরেন্দ্র মোদী বিরোধী প্রচারে যুক্ত সংস্থা— অর্গানাইজড্ ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রোজেক্টের (ওসিসিআরপি-র) সংগৃহীত অর্থের ৫০ শতাংশ আসে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে। সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, দেশজুড়ে কংগ্রেসের পলিটিকাল মেশিনারি বা রাজনৈতিক কাঠামো এবং পশ্চিমি ডিপ স্টেটের (গুপ্ত প্রশাসনের) এজেন্ডার মধ্যে এই সরাসরি যোগসূত্র কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটি হলো ভারত জুড়ে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত প্রয়াস।

(অর্গানাইজার ওয়েব ডেস্ক কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন হতে সংগৃহীত)

জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভর দায়িত্ব পালন করছে বিজেপি

পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে জেহাদিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে বললে তা সত্যের অপলাপ হয় না। এতে করে আপামর হিন্দুর জীবন-জীবিকা, ধন-মান এমনকী প্রাণও বিপর্যস্ত হতে বসেছে। আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, এটি কোনোমতেই রাজনীতির বিষয় হতে পারে না। কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে ওই গুরুতর সামাজিক বিষয়টি রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, ভারতীয় জনতা পার্টির সৌজন্যেই রাজ্য জুড়ে হিন্দুদের ওপর সংঘটিত লাগাতার অত্যাচার সম্বন্ধে রাজ্যবাসী অবগত হতে পেরেছেন। রাজ্য রাজনীতি এই মুহূর্তে যে জেহাদি হামলায় তোলপাড় সেটির অকুস্থল মালদা জেলার মোথাবাড়ি। মোথাবাড়ির ভয়াবহ ঘটনার কথা হয়তো রাজ্যবাসীর অগোচরেই থেকে যেত যদি না বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এই নারকীয় ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেন।

গত ২৭ মার্চ তাঁর পোস্ট করা ভিডিয়োয় কিছু মুসলমান যুবককে ইসলামিক পতাকা নিয়ে মিছিল করতে দেখা যায়। তার পরই ভিডিয়োয় দেখা যায় রাস্তার পাশে দোকানের ভাঙা শেড। ভিডিয়োটি পোস্ট করে সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, 'তোষণসর্বস্ব ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের হিন্দুদের অস্তিত্ব ক্রমশ আশঙ্কার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এই ভয়াবহ ছবি আজকের দক্ষিণ মালদহের মোথাবাড়ি অঞ্চলের চৌরঙ্গী মোড়ের। এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে হিন্দুদের ৬০-৭০টি দোকান ভেঙে লুঠ করা হয়েছে, হিন্দুদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করা হয়েছে এবং মূল রাস্তায় দখল নিয়ে যথেচ্ছাচারে গাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। এলাকার হিন্দুরা ত্রস্ত, আতঙ্কিত কিন্তু এলাকায় কোনো পুলিশের দেখা নেই।

সংখ্যালঘু মুসলমানদের তোষণ করতে করতে রাজ্যের ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরির গোপন অভিসন্ধি ক্রমশই সফল করে তুলছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নিপীড়িত অসহায় হিন্দুরা সম্মিলিত হয়ে এই অন্যায় তোষণ নীতির প্রতিশোধ নেবেন ২০২৬-এ।' এই ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছেন, 'তোষণবাজ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছেন। মালদহ জেলার মোথাবাড়ি অঞ্চলে বেছে বেছে হিন্দুদের দোকানপাট ভাঙচুর ও লুঠ করা হয়েছে। মূল রাস্তা দখল করে জেহাদিরা যথেচ্ছচারে কীভাবে গাড়ি ভাঙচুর করছে দেখুন। জেহাদিদের সামনে পড়ে 'নিধিরাম সর্দারে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া মমতা পুলিশকে দেখুন, হাত জোড় করে যেন করুণা প্রার্থনা করছে!

সংখ্যালঘু তোষণ করতে করতে গ্রেটার বাংলাদেশের ব্লু প্রিন্ট ক্রমশ বাস্তবায়ন করার পথে এগিয়ে চলেছে তোলামূল সরকার।' রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আরও লিখেছেন, 'তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম, এর শেষ দেখে ছাড়বো। আইনি পথে যেমন হাওড়া, শ্রীরামপুর, ডালখোলা, খিদিরপুর, রিষড়া, মোমিনপুরের জেহাদিদের বাগে এনেছি ঠিক একইভাবে এদেরকেও শিক্ষা দেবো।'

মোথাবাড়ির ঘটনার প্রতিবাদে তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার ডিপি চেঞ্জ করে কালো রঙের রিভার্সে 'তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি, মোথাবাড়ি' লিখে, রাজ্যজুড়ে হিন্দুদের ওপর জেহাদি হামলার আরও দুটি ঘটনার দিন দুয়েকের মধ্যে প্রকাশ্যে এনেছেন। তাঁর ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের উপর জেহাদি আক্রমণ অব্যাহত। বিভিন্ন জেলায় একদল শান্তির ছেলেদের (টুইটারে তিনি 'পিসফুল কমিউনিটি' এই শব্দবন্ধনী ব্যবহার করেছেন) দ্বারা হিন্দুদের দোকানপাট, বাড়ি ঘর আক্রান্ত হচ্ছে সম্পত্তি লুট হচ্ছে, হিন্দু মন্দির আক্রান্ত হচ্ছে তাদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতাটুকুও নেই। আজও রাজ্যের দু'জায়গায় এই জেহাদি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। একটি মুর্শিদাবাদের নওদায় এবং অন্যটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরে এবং পুলিশ প্রশাসন যথারীতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ, সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ।

মুর্শিদাবাদের নওদায় নওদা থানার অন্তর্গত ঝাউবোনা ও ত্রিমোহনী বাজারে মোথাবাড়ির কায়দায় জেহাদিরা পুলিশের উপস্থিতিতে বেছে বেছে হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর চালিয়েছে, হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। পুলিশ যথারিতি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। ঝাউবোনায় একটি পানের বরোজ-এ আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে আমি খবর পেয়েছি যে সেখানে এখনো বোমাবাজি চলছে এবং পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ২নং ব্লকের দক্ষিণ বড়বাড়িয়ায় হিন্দু ভক্তরা মা চণ্ডীর পূজা করছিলেন, সেখানে হঠাৎই বেশ কিছু সশস্ত্র জেহাদি আক্রমণ করে এবং অন্ততপক্ষে ১০ জন তাদের আক্রমণে গুরুতর আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য মুগবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এও লিখেছেন, 'রাজ্যের পুলিশ যদি সঠিকভাবে নিজের কাজ করত তাহলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য চাইতে বলেছি, কারণ এখন এই দলদাস পুলিশের পক্ষে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এহেন গভীর সামাজিক উদ্বেগের ও জাতীয় সুরক্ষার বিষয়টি যদি 'মহান ধর্মনিরপেক্ষতা' রক্ষায় সাংবাদিককুল ও তাঁদের মিডিয়া হাউস চেপে যায়, রাজনৈতিক দল হয়েও বিজেপি যদি গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, তাকে কেবলমাত্র রাজনীতির তাগিদ বলে দেগে দেওয়া মূঢ়তা মাত্র। এখানে বলা প্রয়োজন যে আমরা দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের একটি ব্যতিক্রমী সংবাদমাধ্যম ও তার এক বরিষ্ঠ সাংবাদিক বাংলাদেশের হিন্দুদের দুরবস্থা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সতর্ক করার প্রয়াস নিলে তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে লাঞ্ছিত হতে হয়। আসলে বহুকাল যাবৎ এহেন 'সেকুলারিজমে'র প্রাকটিসে আজ হিন্দুদের সচেতন করার কাজটা বিসদৃশ ঠেকবে বইকি! □

নাগপুর হিংসায় জড়িত জেহাদিদেরই সমর্থন করছে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

সম্প্রতি নাগপুরে জেহাদিদের দ্বারা ছড়ানো হিংসায় ৩০ জনেরও বেশি হিন্দু আহত হন। কিন্তু অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি) প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, অতীতে জেহাদিদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের উপর তাদের আইনসঙ্গত দাবি জানিয়ে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হওয়া হিন্দুরাই হলো— উগ্রপন্থী। সেই নিবন্ধে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম বলেছে যে, মুসলমানদের হাতে হিন্দু নির্যাতনের ইতিহাস চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যারা তুলে ধরে বা যারা জেহাদিদের দ্বারা ধ্বংস হওয়া মন্দির পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয় বা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে তাদের উপর জেহাদিদের দ্বারা সংঘটিত আক্রমণের বিষয়ে কথা যারা বলে, তারা 'হিন্দু উগ্রপন্থী'।

যেহেতু এপি একটি ভারত-বিদ্বেষী, পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম, তাই তাদের দ্বারা প্রচারিত প্রতিবেদনটি পিবিএস, সিএনএন, ওয়াশিংটন পোস্ট-সহ আরও অনেকগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণের ঘটনায় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস দ্বারা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দোষারোপের বিষয়টি মোটেও আশ্চর্যের নয়। কারণ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস হলো সেই প্রচারমাধ্যম, যাদের চিত্র সাংবাদিক ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর হামাস সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ইজরায়েলিদের ভয়াবহ গণহত্যায় হামাস সন্ত্রাসীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ইসলামি সন্ত্রাস এবং মুসলমান জেহাদি-গ্যাংস্টারদের মানবিক হিসেবে আখ্যায়িত করার অনৈতিক প্রবণতা বর্তমানে সর্বজনবিদিত। ২০২৩ সালে নিহত গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের অপরাধমূলক চরিত্র, তার বিরুদ্ধে থাকা অসংখ্য খুনের মামলার বিবরণ চেপে গিয়ে, এই খুনি, অপরাধী, সন্ত্রাসীর রাজনৈতিক জীবনকে বড়ো করে দেখায় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।

নাগপুর হিংসার জন্য 'ছাওয়া' সিনেমাটিকে দায়ী করেছে স্কাই নিউজ এবং আক্রমণকারীদের 'আক্রান্ত' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস দাবি করেছে যে, মহারাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উসকে দেওয়ার জন্য 'ছাওয়া' সিনেমাটিই দায়ী। এই দাবির মাধ্যমে 'ইসলাম খতরে মেঁ হ্যায়' জাতীয় মিথ্যা ন্যারেটিভকে তুলে ধরা হয়। ভারতের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ মুসলমান। সংবাদমাধ্যমটির দাবি হলো, ভারতের এই মুসলমানরা মনে করে যে তারা সরকারের মদতপুষ্ট দক্ষিণপন্থী জনতার টার্গেটে পরিণত হয়েছে। এমনকী স্কাই নিউজ হিন্দুদের উপর জেহাদি আক্রমণ ও হিংসার ঘটনাটিও পুরোপুরি চেপে গিয়েছে। অন্যান্য বামপন্থী প্রচারমাধ্যমের মতো স্কাই নিউজও লাভজেহাদকে একটি কন্সপিরেসি থিয়োরি বা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বলে উড়িয়ে দিয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো দেশজুড়ে প্রতি মুহূর্তে এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। স্কাই নিউজ দাবি করেছে যে, বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি পরিচালিত সরকার মুসলমানদের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। মুসলমানদের উপর নির্বিচারে বুলডোজার অ্যাকশন চলছে বলে প্রচার করেছে স্কাই নিউজ। বাস্তবে, কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশ সরকার দাঙ্গাবাজ, জেহাদিদের অবৈধ সম্পত্তি উচ্ছেদের জন্য বুলডোজার ব্যবহার করে।

ক্রূর ও ভয়ংকর মুঘল শাসক ঔরঙ্গজেবের কবর রয়েছে মহারাষ্ট্রের খুলদাবাদে। সম্প্রতি সেই কবর অপসারণের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। তাদের এই আহ্বান উসকানিমূলক বলে জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস্। জেহাদিদের তরফে ছড়ানো হিংসার জন্য হিন্দু সংগঠনগুলিকে দায়ী করেছে এই বিদেশি সংবাদপত্রটি। খালিস্তানি সন্ত্রাসীদের রোমান্টিক (বা রঙিন) ভাবমূর্তি উপস্থাপন, হিন্দুবিরোধী দাঙ্গার পরিকল্পনাকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ এবং বাংলাদেশে জেহাদিদের দ্বারা হিন্দু গণহত্যাকে 'রাজনৈতিক সংঘর্ষ' হিসেবে দেখানোর নজির রয়েছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের। নাগপুরের সাম্প্রতিক জেহাদি হিংসার জন্য তারা হিন্দু সংগঠনগুলিকে দায়ী করেছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ (এনওয়াইটি) লিখেছে যে, '১৭ শতকের এক মুঘল শাসকের কবর অপসারণের জন্য একটি কট্টরপন্থী হিন্দু গোষ্ঠীর আহ্বানে পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্রে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়েছে এবং কার্ফু জারি করা হয়েছে।' এই প্রতিবেদনে নির্লজ্জ সাংবাদিকতার নজির সৃষ্টি করেছে এনওয়াইটি। মুসলমান আক্রমণকারীদের তারা নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। ভুক্তভোগী ও আক্রান্ত হিন্দুদের এই প্রতিবেদনে তারা খলনায়ক হিসেবে তুলে ধরেছে।

গ্লোবাল লেফট্ ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত অন্যান্য পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমের মতো মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে এনওয়াইটি। তারাও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উসকে দেওয়ার জন্য 'ছাওয়া' সিনেমাটিকেই দায়ী করেছে। এনওয়াইটি-র প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, হিন্দু সংগঠনের কার্যকর্তারা ঔরঙ্গজেবের কবর অপসারণের দাবি জানানোর ফলেই এই

হিন্দুসমাজকে তারা বোঝাতে চেয়েছে যে, অতীতে ও বর্তমানে তাদের উপর সংঘটিত জেহাদি নিপীড়নের বিষয়ে হিন্দুরা যদি নীরব থাকত, তাহলে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে হিংসা চালাতে বাধ্য হতো না।

ফঃ ২

ঝামেলা শুরু হয়। এনওয়াইটি-র প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে যে, 'গত ১৭ মার্চ মহারাষ্ট্রে উদ্‌যাপিত হয় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মবার্ষিকী। তিনি ছিলেন এক বীর হিন্দু রাজা, যিনি ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনপর্বই হিংসাত্মক দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়।'

বাস্তবে সেদিন হিন্দুদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি 'ছাওয়া' সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পরও কোনো উত্তেজনা ছড়ায়নি। সমস্যাটি মুসলমানদের জেহাদি মানসিকতা থেকে উদ্ভূত। তারা হিন্দুদের ঘৃণা করে এবং হিন্দু নির্যাতনকারীদের মহান ভাবে। নিজেদের তারা দীর্ঘকাল আগে মৃত ইসলামিক আক্রমণকারীদের উত্তরাধিকারী ভাবে। হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, গৌরব এবং তাদের অস্তিত্বের প্রতি মুসলমানদের যাবতীয় ঘৃণাভাব থেকেই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বাম-জেহাদি ঐতিহাসিক সোহেল হাশমির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সোহেল হাশমির মতে, 'ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজ এবং ঔরঙ্গজেবের মধ্যে বিরোধ ধর্মীয় দ্বন্দ্বের কারণে নয়। এটি ছিল দুই সামন্ত প্রভুর মধ্যে লড়াই।' এই তথাকথিত ইতিহাস-বিশেষজ্ঞের বিকৃত মতামত তাদের সংবাদপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস্। ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনের পরিবর্তে ঔরঙ্গজেব ও তার জেহাদি মানসিকতাকে মানবিকতার চাদরে ঢাকতে তিনি বেশি আগ্রহী। হিন্দুদের হত্যা, হিন্দু মন্দির ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ, হিন্দু নারীর সম্ভ্রমহানি, হিন্দুদের প্রতি বৈষম্য, হিন্দুদের উপর অকল্পনীয় নৃশংসতার বিষয়গুলি ঔরঙ্গজেবের ফরমানে উল্লেখিত হওয়া সত্ত্বেও পাঠকদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করছে নিউ ইয়র্ক টাইমস্। তারা প্রচার করছে যে, ঔরঙ্গজেব একজন হিন্দুবিদ্বেষী, উন্মত্ত জেহাদি ছিলেন— হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এই ধারণা ভুল। তাদের মতে, ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে এই সময়ের মুসলমানদের আনন্দ উদ্‌যাপনের বিষয়টি হিন্দুদের সহজভাবে নেওয়া উচিত।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ তাদের পাঠকদের জানাতে চায় না যে, ভারতীয় মুসলমানরা মূলত সেই ঐতিহাসিক ইসলামি শাসকদের মহিমান্বিত করে, যারা ব্যাপকভাবে তাদের মজহবি উগ্রতার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের জীবন ভারতীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেদের ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী ভাবা মুসলমানদের কাছে ঔরঙ্গজেব হলো অনুপ্রেরণার উৎস। ঔরঙ্গজেব ও টিপু সুলতানের মতো হিন্দুবিদ্বেষী, স্বৈরাচারী শাসকদের তারা বীর মনে করে। সময় হয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের কাছে জবাব চাওয়ার যে, তারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ওসামা বিন লাদেনের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণকে সমর্থন করবে কিনা? পত্রিকাটির জেহাদি কার্যকলাপ সমর্থনের রেকর্ড দেখে বলা যায় যে, তারা সত্যিই হয়তো নিহত ইসলামি সন্ত্রাসবাদী লাদেনের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের বিষয়টিকে সমর্থন করবে। এমনকী তা নির্মাণের অর্থ জোগানের প্রতিশ্রুতি তারা দিলেও তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

নাগপুর হিংসা : গত ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় মহারাষ্ট্রের নাগপুরে যে হিংসা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তা ছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদিদের পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ। শম্ভাজীনগরে ঔরঙ্গজেবের কবর অপসারণের দাবিতে এদিন চলছিল হিন্দু সংগঠনগুলির বিক্ষোভ কর্মসূচি। বিক্ষোভকারীরা স্বৈরাচারী মুঘল শাসকের একটি কুশপুত্তলিকা চাদর দিয়ে ঢেকে তাতে আগুন ধরায়। এই বিক্ষোভ চলাকালীন কোরান পোড়ানোর গুজব ছড়ায় জেহাদিরা। জেহাদিদের আক্রমণে আহত হন ৩০ জনেরও বেশি সাধারণ মানুষ।

হিংসা চলাকালীন নাগপুরের ভালাদারপুরা এলাকায় মুসলমান জনতা এক মহিলা পুলিশ অফিসারের শ্লীলতাহানি করে এবং তাঁর পোশাক খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় গণেশপেঠ থানায় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। নাগপুর হিংসার ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৮৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে; যাদের মধ্যে রয়েছে মাইনরিটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভাপতি এবং নাগপুর দাঙ্গার মাস্টারমাইন্ড ফাহিম খান। ফাহিমের বিরুদ্ধে ৫০০-রও বেশি দাঙ্গাবাজকে জড়ো করে হিংসায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

মহারাষ্ট্র পুলিশ বাংলাদেশের এমন কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুঁজে পেয়েছে যেগুলি নাগপুর হিংসায় প্রত্যক্ষভাবে উসকানি দিয়েছিল। আপত্তিকর এবং গুজব বা মিথ্যা রটনামূলক পোস্ট করা হয়েছে এমন ৯৭টি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করেছে পুলিশ। এই পোস্টগুলির বেশিরভাগই বাংলাদেশি আইপি অ্যাড্রেস- সংবলিত কম্পিউটার বা ডিভাইস থেকে করা হয়েছিল। স্থানীয় হিন্দুরা জানিয়েছেন যে, তাদের বাড়ি আক্রমণ করার পর মুসলমান দাঙ্গাকারীরা বাড়িতে স্থাপিত তুলসীগাছের টবগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন হিন্দু সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, জেহাদিরা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে এবং নোংরা স্লোগান দিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মুখ ঢাকা মুসলমান দাঙ্গাকারীরা হিন্দু দেব-দেবীর ছবি বা মূর্তি ও স্বস্তিক চিহ্নের মতো হিন্দু প্রতীকগুলি যাচাই করে হিন্দুদের যানবাহনগুলি চিহ্নিত করে। গাড়ি ও বাইকগুলি যে হিন্দুদের সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর মুসলমান দাঙ্গাকারীরা সেই গাড়িগুলিকে ভাঙচুর করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। দাঙ্গাকারীরা মুসলমানদের বাড়ি বা মুসলমান মালিকানাধীন যানবাহনগুলিকে আক্রমণ করেনি। বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন যে, জেহাদিরা পেট্রোল, বোমা নিয়ে প্রস্তুত ছিল। তারা শিশুদের উপর পাথর ছুঁড়ে মারছিল। নির্বিচারে আশেপাশের মানুষ এবং সম্পত্তির উপর তারা আক্রমণ চালাতে থাকে। জেহাদি দাঙ্গাবাজরা তরবারি, অস্ত্র ও বোতল সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল এবং তাদের মুখ ঢাকা ছিল।

নাগপুরে মুসলমানদের পরিকল্পনামাফিক হিন্দুবিরোধী হিংসার বিষয়ে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম অপপ্রচার ও মিথ্যা সংবাদের জাল বুনেছে। হিন্দু সংগঠনগুলির তরফে ঔরঙ্গজেবের কবর অপসারণের দাবি উত্থাপন এবং 'ছাওয়া' সিনেমাটিকে জেহাদিদের দ্বারা সংঘটিত হিংসার সূত্রপাতের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছে বাম মনোভাবাপন্ন পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম। মুসসলমান ও জেহাদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলি নাগপুর হিংসাকে অসত্য দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করেছে। হিন্দুরা ঔরঙ্গজেবের কবর উপড়ে ফেলতে চায় বলে মিথ্যা দাবি করেছে। হিন্দু নিপীড়নের প্রতীক ঔরঙ্গজেব যে আজকের দিনের জেহাদিদের প্রেরণার উৎস তা বেমালুম চেপে গিয়েছে এই ধরনের অসৎ সাংবাদিকতা-জাত, পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদন। বামপন্থী সংবাদমাধ্যম জেহাদি হিংসাকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ রূপে চিত্রিত করেছে। হিংসায় আক্রান্ত হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থা এবং সমাজে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে মুসলমানদের পরিকল্পিত সন্ত্রাসকে তারা বিন্দুমাত্রও তুলে ধরেনি।

সমগ্র বাম-ইসলামিক ইকোসিস্টেম নির্লজ্জভাবে দাবি করেছে যে, হিন্দুদের উপর মুসলমানদের নিপীড়নের ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং হিন্দুদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কারণেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এই হিংসা সংঘটিত হয়েছে। হিন্দুসমাজকে তারা বোঝাতে চেয়েছে যে, অতীতে ও বর্তমানে তাদের উপর সংঘটিত জেহাদি নিপীড়নের বিষয়ে হিন্দুরা যদি নীরব থাকত, তাহলে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে হিংসা চালাতে বাধ্য হতো না। □

দ্বিশতাব্দীর দোরগোড়ায় পৌঁছানো ঐতিহ্যবাহী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ কেন উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

ড. বিনয়ভূষণ দাশ

মাত্র উনিশ বছর বয়সে এক সদ্যযুবক এমন এক স্বপ্ন দেখলেন যা তাঁর যুগের সমসাময়িক মানুষের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য কল্পনা বলে মনে হয়েছিল। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের সঙ্গে হয়তো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও'র স্বল্পায়ু জীবন ও কাজের সঙ্গে। কিন্তু বঙ্গপ্রদেশের সমস্ত কিছুই যে বড্ডো কলকাতাকেন্দ্রিক। সুতরাং তাঁর জীবন নিয়ে কোনো চর্চা নেই, কোনো আলোচনা নেই। তিনি, কাশিমবাজার রাজপরিবারের সন্তান রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মাত্র বাইশ বছর ছিল তাঁর জীবনকাল। বঙ্গপ্রদেশের নবজাগরণের মূল সুর আর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। বাস্তবিক ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দেই বহরমপুর-কাশিমবাজারে একটি মহাবিদ্যালয় (কলেজ) স্থাপনের কথা তাঁর চিন্তায় আসে। এই চিন্তা অনুযায়ী তিনি ৭ জানুয়ারি ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে একটি উইল করেন। এই উইলে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে প্রস্তাবিত কলেজের খরচ-খরচার বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি, অধ্যাপক নিয়োগ, পৃষ্ঠপোষক কারা হবেন সে বিষয়, প্রস্তাবিত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিষয়সমূহ, কোথায় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে, কী নাম হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়। তিনি ইংরেজিতে সম্পাদিত তাঁর এই উইলে উল্লেখ করেছিলেন, 'দি সেম (দি কলেজ) শ্যাল বি নেমড রাজা কৃষ্ণনাথ কলেজ'।

এরপরে আরও তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কৃষ্ণনাথের মনে আরও অনেক সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে। রাজা কৃষ্ণনাথের বন্ধু নবীনকৃষ্ণ মিত্র তাঁর 'এফিডেভিটে' উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণনাথ তাঁকে তাঁর উইলে কিছু পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর প্রার্থিত পরিবর্তনের একটি হলো, পূর্বোক্ত উইলে কলেজের স্থলে 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটি লিপিবদ্ধ করা। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা তাঁর মনকে এতটাই অধিকার করে ছিল যে, তাঁর দুঃখজনক আত্মহত্যার ঠিক আগের

দিন, যন্ত্রণাকাতর মুহূর্তেও তা ভুলতে পারেননি। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর আগের দিন, ৩০ অক্টোবর, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর দ্বিতীয় উইল সম্পাদন করে যান। ভারতে সরকারি মহলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা চিন্তাভাবনা করার বহু আগেই, মৃত্যুর আগের দিন করা উইলে তিনি উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করে যান। এছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে একটি হাসপাতাল স্থাপনের সংস্থানও করে যান ওই উইলে। ওই হাসপাতালে একজন ইংরেজ ডাক্তার এবং একজন উপযুক্ত দেশীয় ডাক্তার নিযুক্তির কথাও উল্লেখ করেন ওই উইলে। তাঁর প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও তিনি উল্লেখ করে যান। ওই উইলে তিনি লেখেন, 'শ্যাল বি অ্যাপ্লায়েড টু দি এসটাব্লিশমেন্ট অব এ কলেজ দ্যাট ইজ এ স্কুল ইন মাই নেম দ্যাট ইজ টু বি এনটাইটেলড' দি কৃষ্ণনাথ'স ইউনিভার্সিটি অব বানজেটিয়া।' এটা এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তেরো বছর আগের ঘটনা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের বছরে কলকাতা, বাম্বে ও মাদ্রাজে স্থাপিত হয় ভারতের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু রাজা কৃষ্ণনাথের সাধ অপূর্ণই থেকে যায়। তাঁর সাধের বিশ্ববিদ্যালয়, যেটির হবার কথা ছিল ভারত তথা এশিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু স্থাপিত হতে পারেনি এই বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট উইল থাকা সত্ত্বেও। উইলটি সরকারিভাবে বাতিল বলে ঘোষিত হয় তাঁর মানসিক স্থিতি ঠিক ছিল না এই কারণ দেখিয়ে, যদিও তাঁর দেখা তাঁর দুটি উইল তুলনা করলে তাঁর ধারাবাহিক মানসিকতার পরিচয়ই পাওয়া যায়।

১৮৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গপ্রদেশ সরকার প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা স্কুল এবং প্রতি পাঁচটি জেলায় একটি করে কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী পাঁচটি কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যায় স্থাপনের জন্য স্থান নির্ধারিত হয় মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম, কটক, কৃষ্ণনগর ও ভাগলপুরে। বঙ্গ সরকারের

প্রস্তাবটি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার অনুমোদন করে। তদনুযায়ী ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুনে সরকার বহরমপুর অথবা মুর্শিদাবাদে কলেজটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওই বছরের অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর প্রস্তাবিত কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় বহরমপুরে, নাম দেওয়া হয় 'বহরমপুর কলেজ'। কলেজটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হলেও শেষে কাশিমবাজার রাজপরিবারের দান করা একুশ বিঘা আট কাঠা ন' ছটাক জমিতে স্থায়ী কলেজভবন গড়ে ওঠে। রাজা কৃষ্ণনাথের বিধবা মহারানি স্বর্ণময়ী ও তাঁর ভাগ্নে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দান করা জমিতে তাঁদেরই অর্থানুকূল্যে ও বদান্যতায় মহাবিদ্যালয়টি প্রাণ ফিরে পায়। এক সময় সরকার কলেজটি বন্ধ করার প্রস্তাব করলে মহারানি স্বর্ণময়ী এগিয়ে এসে কলেজটি বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেন। মহারানি স্বর্ণময়ী প্রতি বছর বারো হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু দেখা যায় বাস্তবে তিনি বছরে ১৬ হাজার টাকা করে দিয়েছিলেন।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রানি স্বর্ণময়ী কলেজটির স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি 'এনডাওমেন্ট ফান্ড' খোলার প্রস্তাব করেন যা থেকে কলেজ পরিচালনায় কুড়ি হাজার টাকা করে ব্যয় করা হবে। আর এরই সঙ্গে কলেজটির নাম 'বহরমপুর স্বর্ণময়ী কলেজ' রাখার প্রস্তাব করা হয়। যদিও প্রস্তাবটি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহারানি স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাগ্নে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উপর কলেজটির দেখভালের দায়িত্ব বর্তায়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত পূর্বসূরি রাজা কৃষ্ণনাথের স্মৃতি স্থায়ী করে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সলিসিটর ওয়াটকিন্স অ্যান্ড কোং-এর মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন কলেজটির নাম পরিবর্তন করে 'কৃষ্ণনাথ কলেজ' রাখার জন্য। সেই অনুযায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০২-এর মিটিঙে কলেজের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ওই বছরই কলেজের নাম হয় 'কৃষ্ণনাথ কলেজ'। বিশ্ববিদালয়ের ক্যালেন্ডারে পরের বছর নামটি তালিকাভুক্ত করা হয়। এরপরে কলেজটির যাবতীয় উন্নতি ও ব্যবস্থাপনা দেখভাল করেছেন কাশিমবাজার রাজপরিবারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর পুত্র মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী। তাঁরা কলেজটির উন্নতিকল্পে ধারাবাহিকভাবে দান করে গেছেন।

পরবর্তীকালে মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সময়ে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, তিনি বামফ্রন্ট শাসনকালে 'বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের' দায়িত্ব ছেড়ে দেন। কলেজটি ১৭২ বছরের ঐতিহ্যবাহী ও দেশের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যাদান কেন্দ্র। একসময় অখণ্ড বঙ্গের রাজশাহী বিভাগের কেন্দ্র ছিল বহরমপুর; ফলে সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের ছাত্ররা এই কলেজে পড়তে আসত। এই কলেজের সঙ্গে ছাত্র অথবা শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের পিতা রাজকুমার সরকার, ড. রাধাকমল ও ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের পিতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ড. কালীকিঙ্কর দত্ত, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিখিলনাথ রায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র এডওয়ার্ড এম হুইলার (কৃষ্ণমোহনের কন্যা মনোমোহিনী হুইলারের পুত্র), স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবিএ গনিখান চৌধুরী, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিক্রমকেশরী সরকার, স্বাধীনতা সংগ্রামী মাস্টারদা সূর্য সেন, নলিনী বাগচী-সহ বহু কৃতী বঙ্গসন্তান। কলকাতার হিন্দু কলেজের (প্রেসিডেন্সি কলেজ) মতোই বহরমপুর কলেজ হয়ে উঠে মুর্শিদাবাদ তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের নবজাগরণের পীঠস্থান। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে নাম পরিবর্তনের পরেও ১২২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, অর্থাৎ কলেজটির বয়স ১৭২ পেরিয়ে গেছে। কলেজটি একটি 'হেরিটেজ' কলেজ। বঙ্গে শিক্ষার আদি যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এটি।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য সরকার 'মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, ২০১৮' আইন পাশ করেছে এবং গত (জুলাই '২১) রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ঘোষিত উপাচার্যকে নির্দেশ দিয়েছে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া ও পঠনপাঠন শুরু করতে। যদিও বিষয়টি থমকে ছিল এযাবৎ। সম্প্রতি জানা যাচ্ছে, কলেজটির সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি প্রস্তাবিত মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশের ফলে কৃষ্ণনাথ কলেজের অবলুপ্তি ঘটছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ মানুষ এবং জেলার শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্নভাবে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে, ১৭২ বছরের পুরানো, ঐতিহ্যশালী কৃষ্ণনাথ কলেজকে উন্নীত করে 'কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়' গঠন করা হোক। তাঁরা এজন্য বহরমপুরে একটি সেমিনার করেছে; নানা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছে সরকারের কাছে।

সম্প্রতি কলেজের 'প্রাক্তনী' প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণনাথের নাম যুক্ত রাখার আবেদন জানিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। এক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে কৃষ্ণনাথ কলেজটি 'ডিজলভড' বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, কৃষ্ণনাথ কলেজের জমি, বাড়িতেই নতুন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন হবে। অর্থাৎ 'মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়' আইন অনুযায়ী এই কলেজটি আর নেই।

একজন বাইশ বছর বয়সের শিক্ষাব্রতী যুবকের যুগন্ধর এক স্বপ্নের এইভাবে সমাধি ঘটবে? জেলার মানুষের যুক্তিগ্রাহ্য অনুভূতি ও আবেদনকে অগ্রাহ্য করে একটা ১৭২ বছরের ঐতিহ্যকে এভাবে নষ্ট করে দেওয়া হলো কেন? রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর ও তার মন্ত্রী কি এতোটাই শিক্ষা ও ঐতিহ্য বিমুখ?

এমন উদাহরণ আর আছে কি দেশে? পুনরায় কি ফিরিয়ে আনা যায় না কৃষ্ণনাথের নাম? মুর্শিদাবাদের মানুষের আবেগ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় আধুনিক শিক্ষার জনক, শিক্ষাব্রতী কৃষ্ণনাথের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কি 'কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়' করা যায় না? রাজ্যের সংস্কৃতিমনা শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাদপ্তর একটু ভাবুন না।

(লেখক ইতিহাস গবেষক ও প্রাবন্ধিক এবং কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ, ১৯৭৪)

ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজের নির্মম হত্যার বদলা মরাঠারা কীভাবে নিয়েছিলেন ?

কানু রঞ্জন দেবনাথ

আজকাল ভারত তথা সারা বিশ্বের সিনেমাহলে বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা ভিকি কৌশল অভিনীত, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সুপারহিট হিন্দি ফিল্ম 'ছাওয়া'র জয়জয়কার চলছে। এই নিবন্ধটি লেখা চলাকালীন পর্যন্ত এই সিনেমাটির আয় প্রায় ৫০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছে যাচ্ছে। যারা এই সিনেমাটি দেখেছেন তারা হয়তো ভালো করেই জানেন এই সিনেমায় বর্ণিত মরাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজী মহারাজ ওরফে 'ছাওয়া'র সাহসিকতা এবং মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর মৃত্যুকাহিনি। এই কাহিনি দেখে অনেকেই ভাবুক হয়েছেন, অনেকেই দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, পীড়া সহ্য করতে না পেরে সিনেমা হলেই কেঁদে ফেলেছেন। এখন এই নিষ্ঠুর মৃত্যুকাহিনি যারা দেখেছেন, তারা অবশ্যই এই নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরবর্তী বদলা মরাঠারা নিয়েছিলেন কিনা বা বদলা নিলে কীভাবে নিয়েছেন, তা জানতে আগ্রহী।

ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজ ছিলেন মরাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ছত্রপতি, লেখক, চিন্তাবিদ এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের উত্তরসূরি। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ১২০টি যুদ্ধ করেছেন এবং সবকটিতেই তিনি জয়লাভ করেছেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল আক্রমণ বন্ধে শম্ভাজী মহারাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহসিকতা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

শম্ভাজী মহারাজের জন্ম ১৬৫৭ সালের ১৪ মে মহারাষ্ট্রের পুণের পুরন্দরের দুর্গে হয়েছিল। রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ১৬৮১ সালের ১৬ জানুয়ারি। তাঁর মৃত্যু ১৬৮৯ সালের ১১ মার্চ। তিনি মাত্র ৯ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহান ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী সাইবাঈয়ের পুত্র। তিনি যখন মাত্র আড়াই বছরের, তখন তাঁর মা পরলোকগমন করেন। মায়ের মৃত্যুর পর শম্ভুরাজেকে তাঁর ঠাকুমা জীজাবাঈ লালন-পালন করেন। শম্ভাজী রাজে কেবল তাঁর পিতামহীর প্রিয়ই ছিলেন না এমনকী তাঁর পিতামহ শাহজীরও ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় ছিলেন। পুত্র শিবাজীর মতো জীজাবাঈ তাঁর প্রিয় নাতি শম্ভাজীর মধ্যেও দেশপ্রেম, স্বধর্ম প্রেম, হিন্দু স্বরাজ এবং আদর্শ জীবনের মূল্যবোধ স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি কাশীরাম শাস্ত্রীর কাছ থেকে গণিত, যুক্তি, ভূগোল, ইতিহাস, পুরাণ, রামায়ণ, ব্যাকরণ ইত্যাদি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিতা শিবাজী মহারাজ জীবিতকালে শম্ভাজীকে শারীরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন— যা তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শিবাজী মহারাজ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র হবার কারণে শম্ভাজী 'হিন্দবী স্বরাজ' সৃষ্টির প্রতি তাঁর বাবার প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণ করে বড়ো হয়েছিলেন। তিনি ১৬ বছর বয়সে রামনগরে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং

১৬৭৫-৭৬ সালে গোয়া, কর্ণাটকে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৬৮০ সালের ২০ জুলাই হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয় এবং তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ছত্রপতি হন।

শিবাজী মহারাজের মৃত্যুর তিন মাস পরে শম্ভাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক হয়। ছত্রপতি হওয়ার পর পরই তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। জনসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার করেন, কৃষকদের উপর কর কমিয়ে দেন এবং জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করেন। শম্ভাজী মহারাজ তাঁর রাজ্য 'হিন্দু পুনর্নির্মাণ সমিতি' নামে একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের জন্য ছিল। শম্ভাজী মহারাজের আমলে হরসুল গ্রামের কুলকার্ণী নামে একজন ব্রাহ্মণকে মুঘলরা জোর করে মুসলমানে ধর্মান্তরিত করেছিল। তিনি হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু গ্রামের স্থানীয় ব্রাহ্মণরা তার কথায় কর্ণপাত করেননি। অবশেষে কুলকর্ণী শম্ভাজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে তার দুর্দশার কথা জানান। শম্ভাজী মহারাজ তৎক্ষণাৎ তার পরাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং তাকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। শম্ভাজী মহারাজের এই মহৎ প্রচেষ্টা অনেক ধর্মান্তরিত হিন্দুকে হিন্দুধর্মে আবার প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করেছিল। ছত্রপতি শম্ভুরাজে তাঁর প্রজাদের সুখ-সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতেন। রাজ্যের দারিদ্র্য ও খাদ্য ঘাটতি পুরণের জন্য তিনি ১৬৮০ সালে ঔরঙ্গজেবের খানদেশ সুবার রাজধানী বুরহানপুর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে মরাঠারা একটি বিশাল পরিমাণ ধনসম্পদ হস্তগত করে।

মহীশূর আক্রমণ : খানদেশ এবং বুরহানপুরে মুঘলদের পরাজিত করার পরে সম্ভাজী মহারাজ মহীশূর আক্রমণ করেন। ১৬৮১ সালে তিনি মহীশূর জয় করে গিয়েছেন।

পর্তুগিজদের এলাকা আক্রমণ : পর্তুগিজরা মুঘলদের বাণিজ্যে সাহায্য করেছিল এবং মুঘলদের তাদের অঞ্চল দিয়ে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছিল। শম্ভাজী মহারাজের মূল লক্ষ্য ছিল মুঘল-পর্তুগিজদের মধ্যে জোট ভেঙে ফেলা। এই কারণেই শম্ভাজী যুদ্ধে পর্তুগিজদের আক্রমণ করে পরাজিত করেন, পর্তুগিজ কোষাগার ও অস্ত্রভাণ্ডার দখল করেন এবং পর্তুগিজ সেনাপতি (জেনারেল) তথা অফিসারদের মৃত্যুদণ্ড দেন।

শম্ভাজী মহারাজ ভারত থেকে মুঘলদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সঙ্গমেশ্বরে একটি গোপন সভা করেছিলেন। গণোজী শিরকে ছিলেন শম্ভাজী মহারাজের শ্যালক। শম্ভাজী মহারাজ স্পষ্টতই তাকে বতন্ডারি, জাহাঙ্গিরি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাই গণোজী শিরকে মুঘলদের সঙ্গে হাত মেলান। গণোজী শম্ভাজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং মুঘল সর্দার মুকার্রম খানকে জানান যে শম্ভাজী মহারাজ সঙ্গমেশ্বরে আছেন। শম্ভাজী রাজে তাঁর অভিযানে যে গোপন পথগুলি ব্যবহার করতেন তা কেবল মরাঠারাই জানতো। গণোজী মুকার্রম খানকে সঙ্গমেশ্বরের গোপন রাস্তার কথা বলেছিলেন। শম্ভাজী মহারাজ কিছু সর্দার এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের সঙ্গমেশ্বরে ডেকেছিলেন। এই গোপন বৈঠকের পর গ্রামবাসীদের অনুরোধে তিনি তাদের কথার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি হন। তিনি তার সঙ্গের সেনাবাহিনী রায়গড়ে পাঠান এবং তার সঙ্গে মাত্র ২০০ সেনা, তাঁর বন্ধু কবি কালশ এবং ২৫ জন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা রাখেন। যখন শম্ভাজী মহারাজ গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন ১০ হাজার মুঘল সৈন্য তাকে এবং তার সঙ্গীদের ঘিরে ফেলে। সবাই অতি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এক ভয়াবহ রক্তপাত ঘটে যেখানে শম্ভাজী মহারাজের সেনাবাহিনী তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিশাল মুঘল সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়। অবশেষে ১৬৮৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি শম্ভাজী এবং তাঁর বন্ধু কবি কালশ বিশ্বাসঘাতক মুঘলদের হাতে বন্দি হন।

প্রথমে মুঘল সেনারা শম্ভাজী মহারাজ এবং কবি কালশকে বাহাদুরগড়ে নিয়ে যায়। তারপর তাদের শেষ দিনগুলিতে তাদের ভীম, ভামা এবং ইন্দ্রায়নীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত তুলাপুর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঔরঙ্গজেব তাদের উভয়ের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করে। ঔরঙ্গজেব শম্ভু রাজে এবং কবি কালশকে জোকারের পোশাক পরিয়ে এবং উটের সঙ্গে বেঁধে অপমান করে। মুসলমান সেনারা কেউ পাথর, কাদা, গোবর ইত্যাদি ছুঁড়ে মারে। শম্ভাজী এবং কবি কালশ উভয়েই তাঁদের পূজিত দেবীর নাম 'জগদম্বা', 'জগদম্বা' জপ করতে করতে সমস্ত কিছু সহ্য করেছিলেন। অপমানজনক ব্যবহারের পর শম্ভাজী মহারাজকে ঔরঙ্গজেবের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঔরঙ্গজেব প্রাণ ভিক্ষার জন্য শম্ভাজী মহারাজের সামনে তিনটি শর্ত রাখে। (১) সমস্ত মরাঠা দুর্গ মুঘলদেরকে দিয়ে দিতে হবে। (২) মুঘল দরবারের কর্মকর্তা যারা মরাঠাদের গোপনে সাহায্য করে থাকে তাদের নাম বলে দিতে হবে। (৩) ইসলাম গ্রহণ করতে হবে।

শম্ভাজী মহারাজ সব শর্ত প্রত্যাখ্যান করেন। এরফলে ঔরঙ্গজেব আরও বেশি করে শম্ভাজী মহারাজ ও কবি কালশের ওপর অত্যাচার ও অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। মুঘল সৈন্যরা ধীরে ধীরে চিমটা দিয়ে তাদের নখ টেনে বের করে এবং তার পর একে একে তাদের আঙুল কেটে ফেলে। প্রতিটি নৃশংসতার পর ঔরঙ্গজেব শম্ভাজীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে, কিন্তু প্রতিবারেই অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন। একদিন রাগে ঔরঙ্গজেব শম্ভাজী মহারাজের জিহ্বা কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়। এর কয়েকদিন পর শম্ভাজীর শরীরের চামড়া তুলে ফেলা হয়। তারপর গরম লোহার রড দিয়ে তার চোখ উপড়ে ফেলা হয়। কয়েকদিন পর শম্ভাজী মহারাজের দুটি হাতই একে একে কেটে ফেলা হয়। সবশেষে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। একটি বিশেষ অস্ত্র দিয়ে তার মাথা দুই টুকরো করা হয় এবং মুঘলরা তুলাপুরে ভীমা নদীর সঙ্গমস্থলে সেই সমস্ত টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এভাবে শম্ভাজী মহারাজ নিজের জীবন উৎসর্গ করেও তাঁর

স্বধর্ম এবং আত্মসম্মান ত্যাগ করেননি। তাঁর আত্মত্যাগের কারণে সমস্ত মরাঠা এবং অন্যান্য হিন্দু রাজা একত্রিত হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। যার কারণে কয়েক বছরের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। শিবাজী মহারাজের হিন্দুস্বরাজ্য রক্ষা এবং হিন্দু ধর্মের পরিচয় রক্ষার জন্য ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজকে 'ধর্মবীর' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর সাহসিকতা এবং উচ্চ চরিত্র আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

শম্ভাজী মহারাজের মৃত্যুর বদলা কীভাবে মরাঠারা নিয়েছিলেন?

ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজের রাজত্বকালে সন্তাজী ঘোরপড় ছিলেন একজন বিশিষ্ট সেনাপতি। সন্তাজী ঘোড় পড়ে মারাঠা সাম্রাজ্যের জ্যেষ্ঠ ঘোরপড়ে বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সন্তাজী এবং ধনাজী যাদব একসঙ্গে মুঘলদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। যখন ঔরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজকে বন্দি করে হত্যা করে, তখন মালহোজী ঘোরপড়েও ছত্রপতি শম্ভাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। এই মালহোজীর ঘোরপড়ের পুত্র ছিলেন সান্তাজী ঘোরপড়ে। এই ঘটনা সমগ্র মরাঠা সাম্রাজ্যকে ক্ষুব্ধ করে এবং সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়। এরপর শম্ভাজী মহারাজের পর তার ছোটো ভাই রাজারাম মরাঠা সাম্রাজ্যের ছত্রপতি হন। ঔরঙ্গজেব তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মহারাষ্ট্রের তুলাপুর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে।

হঠাৎ সন্তাজী ও ধনাজী তুলাপুর আক্রমণ করেন। গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী সন্তাজী তার মরাঠা যোদ্ধাদের নিয়ে আহত বাঘের মতো ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন। সন্তাজী তার সঙ্গীদের নিয়ে গাজর-মুলার মতো মুঘলদেরকে হত্যা করা শুরু করেন। তুলাপুরে সন্তাজীর নেতৃত্বে মরাঠাদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুঘলরা দিশাহারা হয়ে চিৎকার করতে শুরু করে। একদিকে পুরো মুঘল সেনাবাহিনী ঔরঙ্গজেবের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল এবং অন্যদিকে মরাঠারা মুঘলদের মৃতদেহ স্তূপ করে রাখছিল। মরাঠারা মুঘল শিবিরে প্রবেশ করে। এত বেশি মুঘল সৈন্য মারা গিয়েছিল যে ঔরঙ্গজেব কোনোভাবে নিজের জীবন বাঁচতে পেরে পালিয়ে যায়। পরের দিন সকালে ঔরঙ্গজেব মুঘলসেনার মৃত্যুর দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যায়। এই ঘটনার পর মুঘল এবং তাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মুঘল ইতিহাসবিদ কাফি খানের মতে, যে কোনো মুঘল সৈন্য ভয়ংকর সন্তাজীর মুখোমুখি হলে হয়তো নিহত হতো নয়তো বন্দি হতো। এই ঘটনার মাত্র দুই দিন পরে সন্তাজী রায়গড় দুর্গ আক্রমণ করেন। ছত্রপতি শম্ভাজীর স্ত্রী যেশুবাঈকে বন্দি করে রাখা মুঘল সর্দার জুলফিকার খানের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার পর তিনি রায়গড় দুর্গে হত্যালীলা চালান এবং অসংখ্য ঘোড়া ও হাতি-সহ মুঘলদের অমূল্য ধনসম্পদ দখল করে পানহালায় ফিরে আসেন। এবার মুকার্রম খানের পালা, যে ছলনা ও প্রতারণার মাধ্যমে ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজকে বন্দি করেছিল। ঔরঙ্গজেব মুকার্রম খানকে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর ও কোঙ্কন প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেছিল। ১৬৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মরাঠারা মুকার্রম খানের বিশাল সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলে এবং তুলজাপুরে যে হত্যা চালিয়েছিল তারই দৃশ্য পুনর্নির্মাণ করে, ভয়াবহ যুদ্ধে সন্তাজী ঘোরপড়ে মুকার্রম খানকে তাড়া করে হত্যা করেন। রক্তাক্ত মুকার্রম খানের দুর্দশা দেখে মুঘল সেনাবাহিনী তাকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, কিন্তু মুকার্রম খান সেখানেই যন্ত্রণায় মারা যায়। মুকার্রম খানকে হত্যা করে মরাঠারা ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়।

সম্ভাজী ঘোরপড়ের সাহস ও বীরত্বে খুশি হয়ে ১৬৯১ সালে ছত্রপতি রাজারাম মহারাজ তাকে মরাঠা সাম্রাজ্যের সেনাপতি ঘোষণা করেন। এরপর সন্তাজী দ্বিগুণ উৎসহ নিয়ে ১৫ থেকে ২০ হাজার মরাঠা সেনাবাহিনী নিয়ে কর্ণাটকের দিকে যাত্রা করেন। কৃষ্ণা নদী পার হওয়ার পর তিনি একের পর এক মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে মরাঠা সাম্রাজ্যের বিজয় ঘোষণা করেন এবং ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীকে সেখান থেকে উৎখাত করেন। মরাঠাদের ভয়ে ঔরঙ্গজেব সহ্যাদ্রি পর্বতমালার এখানে সেখানে ছুটে বেড়াতে লাগলো। ২৭ পছর ধরে মরাঠারা ঔরঙ্গজেবকে এতটাই তাড়া করে যে তার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মরাঠাদের হাতে মুঘলদের ক্রমাগত পরাজয়ের পর, ঔরঙ্গজেব হতাশ হয়ে পড়ে। সন্তাজী ঘোরপড়েই তাঁর যুদ্ধ অভিযানের মাধ্যমে ঔরঙ্গজেবের নাক কেটে দিয়েছিলেন এবং ইতিহাসে ঔরঙ্গজেবকে পলাতক ও ভীরু প্রমাণ করেছিলেন।

সন্তাজী ঘোরপড়ে কে? সন্তাজী ঘোরপড়ের জন্ম ১৬৬০ সালে মালহোজী ঘোরপড়ের ঘরে। মরাঠারা গেরিলা যুদ্ধে দক্ষ ছিল। রাজারাম ভোঁসলের রাজত্বকালে সন্তাজী ছিলেন ষষ্ঠ মারাঠা সেনাপতি। তিনি যুদ্ধে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ এবং শম্ভাজী মহারাজকেও সমর্থন করেছিলেন। তিনি সারাজীবন মরাঠা সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্বরাজ্যের জন্য নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে গেছেন। □

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষকে উপলক্ষ্য করে আগামী ১৪, ২১ ও ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের স্বস্তিকা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। এই তিনটি বিশেষ সংখ্যা সঙ্ঘের তথা বিবিধ ক্ষেত্রের দেশব্যাপী কার্যকলাপ ও কার্যবৃদ্ধির তথ্যে সমৃদ্ধ হবে।

দাম একই থাকছে ১৬.০০ টাকা। সত্বর কপি বুক করুন। কমপক্ষে ১০ কপি নিলে ২৫% কমিশন দেওয়া হবে।

—ব্যবস্থা বিভাগ, স্বস্তিকা

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

আন্দোলন ও নেতৃত্বের স্বরূপ

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

সাধারণ মানুষের বিচার করার ক্ষমতা, বিশেষ করে রাজনৈতিক বিচার ক্ষমতা সব সময় থাকে না। বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি এবং অগ্রমুখ নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা মানুষের আন্দোনের অভিমুখ তৈরি করে। কেবল সুশাসন দিয়ে জনগণকে নিজেদের অনুগত করে রাখার কঠিন রাস্তায় শাসকরা হাঁটার চেয়ে, শাসক সেই জনগণের ওপরে এক দুর্নিবার ভীতি সঞ্চারের সহজ পথ বেছে নিয়ে থাকে। শাসক তার পরিচালনা ব্যবস্থায় এমন একটি বাতাবরণ তৈরি করে যে, তুমি শাসকের পক্ষ না নিলে আমার দ্বারা তোমার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। শাসক বোঝে এই ভীতি যত প্রবল, তার আসন তত অটল। তবে যুগে যুগে এই দুর্দান্ত প্রতাপ শাসকদের তখনই পতন ঘটেছে যখন সে চরম ভুল করে হাত দিতে চেয়েছে— জনগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, তার পরিবারের নারীর সম্মানে। এ রাজ্যেই জোতদার-জমিদার, নন্দীগ্রাম, আরজি কর সেসব ইতিহাস তৈরি করেছে আগেই। রাজ্যে জনগণের সম্পত্তি ও নারীর সম্মান আজ ভূলুণ্ঠিত।

যে কোনো শাসকের পরিবর্তনের জন্য মানুষকে সংগঠিত করে তুলতে রাজপথ-আন্দোলনই শেষ কথা। এই সব পরিস্থিতিতে শাসক তার প্রচার ব্যবস্থায় প্রমাণ করার চেষ্টা করে— এটা আসলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ষড়যন্ত্র, মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টা। এটা হয়তো ভীষণ স্বাভাবিক। তবে ক্ষোভ-ঘৃণায় সৃষ্ট শাসক বিরোধী আন্দোলন তখনই গতি হারায় যখন এই জনপ্লাবন, জন বিক্ষোভকে ব্যক্তি বিশেষের বলে দাবি করে

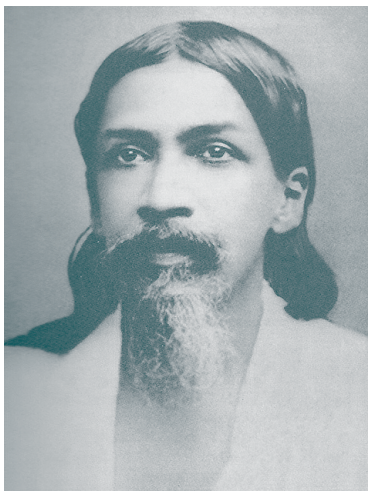

বসেন কেউ কেউ। অথচ এ প্লাবন জোয়ারের মতো, এ স্রোত উঁচু হিমালয় থেকে গড়িয়ে আসা হিমবাহের মতো অপ্রতিরোধ্য। এ শক্তি প্রকৃতির, ঈশ্বরের সৃষ্টি। কোনো একক মানুষের দ্বারা এর নিয়ন্ত্রণ হবে ভাবাটা বজ্রকে কোনো উঁচু গাছের অনুরোধে নিয়ন্ত্রিত হতে বলার সমার্থক। বরং এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি সম্মিলিত প্রয়াস, প্রবীণ ও নবীনদের সম্মেলন। জনগণের দ্বারা তারা সমুচিত দণ্ড পাবেন, যদি তারা এই মহাসাগরের মহাপ্লাবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যক্তিগত পছন্দ কিংবা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালনার চেষ্টা করেন।

নেতৃত্বের ভূমিকা ও আচরণ নিয়ে ঋষি অরবিন্দ তাঁর 'বিপ্লব ও নেতৃত্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন— 'প্রবীণ নেতারা চিরকালের নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করেন। কারণ, তাদের পূর্বের অবদান ছিল। এরা হয়তো কিছু আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছেন বা সুরচিত আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। যাঁরা দেশ সেবার জন্য ব্যক্তিগত কষ্ট ভোগ করেছেন বা আত্মত্যাগ করেছেন, তারাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন যে, তাদেরও একথা কল্পনা করা উচিত নয় যে, তাদের এ অবদান একমাত্র চরম আত্মত্যাগ।'

১৯০৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন— 'অতীত অবদান তাকে (কোনো নেতাকে) অন্য নেতৃত্ববৃন্দের তুলনায় অগ্রাধিকার দেবে ততদিন, যতদিন তিনি সময়ের প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে জনসাধারণের অনুভূতিকে বাঙ্ময় রূপ দিতে সমর্থ হবেন। যে মুহূর্তে তিনি জনতার আকাঙ্ক্ষাকে আত্তীকরণ করার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছাকে জোর করে জনগণের উপর চাপিয়ে করার উদ্দেশ্যে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন, সেই মুহূর্তে তিনি নেতৃত্বের অধিকার চ্যুত হয়ে যাবেন।'

'নেতা যখন সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে চলতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েন, তখন তার একমাত্র পথ হওয়া উচিত সরে দাঁড়ানো। তার বদলে তিনি যদি দাবি করেন যে, যেহেতু তিনি নেতৃত্বে আছেন তার জন্য জগতের গতি স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করবে, তাহলে সেই চাহিদা হবে তেমনই, যার বিরুদ্ধে মানুষের বিবেক বা বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহ করে।'

আমাদের একতাবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে। একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রতের মতো করে সর্বোচ্চ আত্মনিয়োগ করতে হবে লক্ষ্য পূরণের জন্য। এটা দেশের সেবা এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা মুক্তির পবিত্র বিপ্লব। ব্যক্তিগত প্রাপ্তির ঠুনকো আকাঙ্ক্ষা ছেড়েই আমাদের এ কাজে যুক্ত হতে হবে। ঋষি অরবিন্দের সেই উদাত্ত কণ্ঠ আমাদের আরও একবার স্মরণ করায়— 'আমরা কি মাতৃসেবা করি পুরস্কারের জন্য বা ঈশ্বরসেবা করি ভাড়াটিয়ার মতো? দেশপ্রেমিক দেশের জন্য বেঁচে থাকেন। কারণ, তাকে বাঁচতেই হবে, তিনি দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করেন। দেশের দাবি তাই এবং সেটাই হচ্ছে শেষ কথা।' □

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন খুবই জরুরি

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে গেলে হিন্দুদের একতাবদ্ধ হতে হবে। গণতান্ত্রিক দেশে মানুষ যে কোনো দলকে পছন্দ করতে পারে কিন্তু রাজ্যের সুরক্ষা তথা সনাতন সংস্কৃতিকে বাঁচাতে এই রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতায় আসা খুব জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা দীর্ঘদিন অপশাসনের মধ্যে থাকতে থাকতে কেমন যেন মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। তারা ভাবছে যেভাবে রাজ্য চলছে সেটাই স্বাভাবিক। পাঁচশো, হাজার টাকার ভাতা নিয়ে কোনো রকমে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু গত পনেরো বছরে একটা জেনারেশন যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়ে গেছে, আর দেরি করলে এ রাজ্যের হিন্দু সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বিজেপির নিছক ক্ষমতায় আসার জন্য নয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে এই অপশাসনের পরিবর্তন দরকার। প্রতিপক্ষকে কখনো দুর্বল ভাবতে নেই। তোলামূল পার্টি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার জন্য টেস্ট পেপার যেমন প্র্যাক্টিস করে, তেমনি আইপ্যাকের থেকে কোচিং নেয়, আবার পরীক্ষায় টুকলিও করে, পরীক্ষা হলে গার্ডদের নিষ্ক্রিয় রাখতে পারে এবং প্রয়োজনে রেজাল্ট বেরোবার আগে নম্বর বাড়িয়ে নিতে পারে, খাতাও পালটাতে পারে।

তাই এবারের বিধানসভা ভোটকে পরীক্ষা না মনে করে ধর্মযুদ্ধ মনে করে বিজেপিকে এগোতে হবে। এই যুদ্ধে আমাদের সনাতন ধর্মের উপদেশ কাজে লাগতে পারে— যেমন কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের চতুর উপায় --- 'সাম-দান-দণ্ড-ভেদ' (Persuation, Bribery, Punishment division), অথবা মা সারদার বাণী— 'যখন যেমন তখন তেমন' প্রয়োগ করতে হবে।

এবার বিষয়গুলিতে আসি— ১. হিন্দু প্রধান গ্রামগুলির অল্প শিক্ষিত মহিলারা কোনটা ভারত আর কোনটা অসম তাই বোঝে না, তারা ডেমোগ্রাফি চেঞ্জের বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারে না, ভাতা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাই তাদের ভোট কীভাবে পাওয়া যাবে তার উপায় বের করতে হবে।

২. শহুরে সিউডো সেকুলারদের প্রভাব মুক্ত করতে এবং বামেদের ভোট নষ্ট করা আটকাতে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে, এর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, সেনাকর্তা, অর্থশাস্ত্র জানা লোক, সাধু-সন্ন্যাসী সবাইকে থাকতে হবে।

৩. মোল্লা-মৌলবিরা ভোটের আগে মসজিদে এই রাজ্যের মুসলমাদের একটি নির্দিষ্ট পার্টিকে ভোট দেবার ফতোয়া দেয়। মসজিদ ও সেই মোল্লা-মৌলবিদের নামের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে পোস্টার আকারে। একই সঙ্গে গোটা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে সমস্ত মন্দির ও আশ্রমে এই পোস্টার লাগাতে হবে এবং সেই মন্দিরগুলিতে এলাকার হিন্দুদের নিয়ে বৈঠক করে তাদের একত্র হতে আবেদন করতে হবে।

৪. এলাকা ভিত্তিক ব্যস্ত মানুষের কাছে সরকারি বঞ্চনা, বন্ধ কল কারখানা, পরিযায়ী হিন্দু শ্রমিকদের সমস্যা, খানাখন্দ ভরা রাস্তা, অবৈধ নির্মাণ, বালি চুরি, পুকুর ভরাট করা, জেলার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পরিষেবার অভাব, অত্যধিক ভিড়, দালালরাজ, একটি আঞ্চলিক দলের সর্বভারতীয় সভাপতির চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ ভ্রমণ, সাল ও তারিখ ধরে ধরে নারী নির্যাতন এবং দোষীদের নাম ঠিকানা এবং থানা ধরে ধরে পুলিশের তোলাবাজি, দুর্নীতিতে যুক্ত সরকারি আধিকারিকদের ছবি-সহ তাদের কুকর্মের বিবরণ তুলে ধরে দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি সচিত্র ব্যানার, পোস্টার, রাস্তায় সচিত্র পুস্তিকা বিতরণ, সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার ইত্যাদি ভোটের অনেক আগে থেকেই করা জরুরি।

৫. বিজেপি কর্মীরা অনেক প্রাণ দিয়েছেন, আর নয়। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট রুখতে এবং বিজেপি কর্মীদের ও ভোটারদের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশকে জেলা ভিত্তিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর অধীনে রেখে ভোটের ডিউটি করানো যায় কিনা ভাবা উচিত। এর জন্য সংবিধান ও আদালতের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। দুষ্কৃতী দমন ও নাগরিক সুরক্ষার জন্য এবার সর্বোচ্চ পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগ নিতান্তই প্রয়োজন। মহৎ উদ্দেশ্য এবং ধর্মযুদ্ধে ছল বল কৌশল অবলম্বন করা অন্যায় নয়।

—ডাঃ জয়জিৎ ঘটক,
সোনারপুর, দ: ২৪ পরগনা।

বেলুচিস্তান নামটি সংস্কৃত

পাকিস্তানের অন্যতম রাজ্য বেলুচিস্তান বা বালুচিস্তান। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পাকিস্তান অধিকৃত এই রাজ্য। এর পশ্চিমে ইরান, পূর্বে সিন্ধু প্রদেশ এবং দক্ষিণে আরব সাগর রয়েছে। প্রচলিত মতানুসারে বেলুচ জাতি থেকে বালুচিস্তান হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে বালুচিস্তান নামটি ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-ইরানীয়। সহজ কথায় সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে। দেশটি মূলত একটি পর্বতময় অঞ্চল। এর ভেতর দিয়ে অনেক মরুভূমি ও অনাবাদী সমভূমি রয়েছে। বৃষ্টিপাত খুবই কম। মরুভূমি হওয়ার অর্থ বালুকাময় অঞ্চল। 'বালুকা' একটি সংস্কৃত শব্দ। বালুকা অনুকরণে বালুচিস্তান বা বেলুচিস্তান নাম হয়ে যায়। এখানে স্থান বা স্তান মানে ভূখণ্ড বা অঞ্চল। 'চি' শব্দের অর্থ 'of' বা 'অব' হতে পারে। মোটের উপর বালুর স্থান হচ্ছে বেলুচিস্তান।

প্রসঙ্গত লোক ইতিহাসের কথা বলতে হয়। আসিরিয়ার রানি সেমিরামিস ও পারস্যের রাজা সিরুসের সেনাবাহিনী বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে হারিয়ে যায়। লোক ইতিহাস মরুভূমি বা বালুকার কথাই বলে।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

ভারতীয় সেনায় দশভুজারা

মৌ চৌধুরী

সকলেরই মনে আছে ২০২২ সালের ২৬ জানুয়ারির দিনটি। এদিন দিল্লির লালকেল্লার সামনে দেশের সেনাবাহিনীর প্রধান তথা রাষ্ট্রপতির সামনে প্রথাগত কুচকাওয়াজে একটি সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লে: কর্নেল রেখা শর্মা। রাজস্থান ইউনিটের এই তরুণী সেনানীর দৃপ্ত পদচারণা, ব্যক্তিত্ব আর শরীরের ভাষা এখনও সকলের মনে আছে। কুচকাওয়াজে আরও অনেকে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু রেখা যেন হয়ে উঠেছিলেন অনন্য। পরের দিনের সংবাদমাধ্যমে রেখা শর্মাকে নিয়ে আলাদা ফিচার প্রকাশিত হয়েছিল। এইদিনে হিমালয় থেকে সাগর টেলিভিশনের সামনে বসা দর্শক দেবী দুর্গার প্রতীক রেখার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। কেবলমাত্র রেখাই নন, ২০২৪ সালে এশিয়ান গেমসে রৌপ্য পদক প্রাপ্ত সুবেদার প্রীতি রজক অনেকের কাছে প্রেরণার উৎস। শুধুমাত্র রেখা বা প্রীতিই নন, সাম্প্রতিক সময়ে মেজর হরপ্রীত কৌর, গোর্খা রেজিমেন্টের বেনারস শাখার ডেপুটি বিগ্রেডিয়ার প্রতিভা বিস্ত, উইং কমান্ডার ললিতা নাইডু, সদ্য সেনা পাইলট হিসেবে যোগ দেওয়া দিল্লির একতা গিল, পশ্চিমবঙ্গের শুকনা ডিফেন্স ট্রেনিং এরিয়া কমান্ডার ক্যাপ্টেন মধু পাসোয়ান-সহ অসংখ্য ভারত-কন্যা আছেন তাঁরা সকলেই একই রকম প্রদীপ্ত।

তবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নারীদের যোগদান অল্প দিনের নয়। সুদূর অতীতকে বাদ দিলেও মধ্যযুগে দেখা গিয়েছে মালোয়া রাজ্যের এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করা গোন্ডোয়ানা- চান্দেল রাজ্যের রানি দুর্গাবতী এবং ইরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রণী রানি লক্ষ্মীবাইয়ের সেনাবাহিনীতে নারীরা ছিলেন। শিবাজীর সেনাবাহিনীতে নারীরা সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক কারণে অনেকেই মানতে না চাইলেও কেবলমাত্র সম্পূর্ণ ভারতীয়দের নিয়ে প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী আইএনএ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি)। এই বাহিনী গঠন করেছিলেন রাসবিহারী বসু যার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজী তাঁর সেনাবাহিনীতে নারী রেজিমেন্ট তৈরি করেছিলেন, নাম ছিল রানি অব ঝাঁসি রেজিমেন্ট। যার প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সাইগল। এই বাহিনীর আরেক জন মহান নারী সৈন্যের কথা বলতেই হয় তিনি মীরা আর্য। দেখা গিয়েছে পরবর্তী সময়ে আইএনএ-র অনেক পুরুষ পদাধিকারী ব্রিটিশদের ভয়ে বা বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে এবং সদ্য স্বাধীন খণ্ডিত ভারতের শাসকদের বিভিন্ন প্রলোভনে সাড়া দিয়ে নেতাজীর বিরুদ্ধে গিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাদের বেশ কয়েকজন তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে এমন সাক্ষ্যও দিয়েছেন। কিন্তু বারবার মনে আসে ঝাঁসি রেজিমেন্টের একজন সদস্যও শত প্রলোভন ও অত্যাচারের পরেও নেতাজীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেননি। তাঁরা সত্যের পথে থেকেছেন। ভারতের এই মহান নারীরা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ও লেখায় সকলেই নেতাজীকে দেবতার আসনে স্থান দিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পরেও নারীদের 'সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী' তৈরি করা হয়নি। প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে শত্রু দমন করা, ফাইটার প্লেন চালনা, ট্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন ভারি সমরাস্ত্র চালনা কোনোও ক্ষেত্রেই নারীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ভারতীয় নারীদের দুর্গাশক্তির সঙ্গে তুলনা করা হলেও প্রতিরক্ষা বিভাগ বিষয়টি নিয়ে সেই অর্থ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। যদিও সেনায় নারী নিয়োগ নিয়ে ভাবনাচিন্তা ছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল ডিফেন্স ট্রেনিং এবং পরবর্তী সময় অতীব কষ্ট সাধ্য। শারীরিক সক্ষমতা চূড়ান্ত হতে হয়। প্রতিনিয়ত কঠোর অনুশীলন বাধ্যতামূলক। নারীদের পক্ষে বিষয়গুলি কিছুটা কঠিন। কিছুটা নিয়ম

পরিবর্তন করে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অফিসার পদে পরীক্ষামূলকভাবে নারীদের নিয়োগ শুরু হয়। কিন্তু ধারাবাহিকতা ছিল না। নারীদের সেই অর্থে কোনো দায়িত্বশীল পদও দেওয়া হয়নি। নিয়ম মেনে পদোন্নতির খুব বেশি সুযোগ ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রথম এনডিএ সরকার গঠিত হওয়ার পর পূর্বতন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে নিয়মিত, প্রথাগত ও যথাযথভাবে নারীদের ভারতের প্রতিরক্ষা অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণের জন্য পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র দেন। নতুন ব্যবস্থায় প্রথমবার ২১৪৪ জন পরীক্ষায় বসেন। তার ভেতর ৯১৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

এর ভেতর শ্বেতা চিল্লার কর্নেল পর্যন্ত হয়েছিলেন। ফল যাই হোক না কেন বাধা কিন্তু কাটল। তখন অনেকেই বলেছিলেন এই অনুমতি বাতিল করা হোক। কিন্তু মোদী সরকার শোনেননি। এখন তো ইতিহাস।

যদিও সকলেই মনে করেন যাত্রাপথ এখনও অনেক বাকি। প্রতিরক্ষা দপ্তরের হিসাব অনুসারে দেশে সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে সেনা সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। এর ভেতর পদাতিক বাহিনীতে নারী সৈন্যের সংখ্যা ০.৫৬ শতাংশ। বিমান বাহিনীতে ১.০৮ শতাংশ, তবে নৌসেনায় এই সংখ্যা ৬. ৫ শতাংশ। তবে দিন দিন এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রতিরক্ষা বিভাগে নাম লেখাতে গত ২০২৩ সালে ৯৪৮৪৯ জন নারী পরীক্ষায় বসেছিলেন। একটি সংবাদপত্রের সমীক্ষা অনুযায়ী ফাইটার প্লেন চালনার স্বপ্ন নিয়ে বিভিন্ন এয়ার কোর্স সেন্টারে ১৮ উত্তীর্ণ মেয়ে নাম লিয়েছেন। এখানে একটু ক্ষোভের কথা বলা যেতেই পারে। রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় বেহালা ফ্লাইং ক্লাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

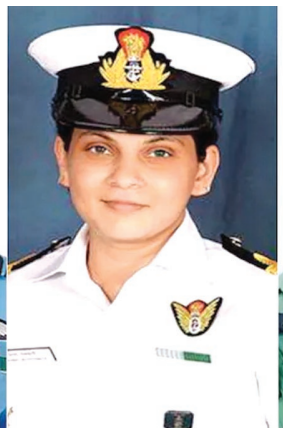

১৮৮৮ সালে ব্রিটিশরা ইন্ডিয়ান মিলিটারি নার্সিং সার্ভিস গঠন করে। নামে ইন্ডিয়ান থাকলেও বিভিন্ন দেশের ব্রিটিশ কলোনির নারীরাও এই সার্ভিসে যুক্ত হতে পারতেন। তবে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল প্রচুর। দেখা গিয়েছে ব্রিটিশ সেনাদের কাছে তাদের কোনো সম্মান বা সম্ভ্রম তাদের ছিল না। যদিও এই নার্সরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আহত ব্রিটিশ সেনাদের প্রভূত সেবা করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্বাধীন ভারতে সেনাবাহিনীতে নারীর প্রবেশ নিষেধ ছিল এমনটা নয়। ব্রিটিশ জামানার শেষ দিক থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চিকিৎসক, শিক্ষক, নার্স, অফিস স্টাফ, সাফাই কর্মী ইত্যাদি পদে নারীদের নিয়োগ করা হয়েছে। নারী চিকিৎসকরা নিয়ম মেনেই উঁচু পদে গিয়েছেন। কিন্তু চলতি কথায় কেউ 'আসল মিলিটারি' হতে পারেননি।

এখন তো ছবিটা ভিন্ন, সমাজের অন্যান্য স্তরের মতো সেনা বাহিনীতেও নারীরা আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। হাজার হাজার 'আসল মিলিটারি' নারী সমাজের যোগ্য সম্মান পাচ্ছেন। তাই বলে তাঁরা সংসার সমাজ উপেক্ষা করে রয়েছেন এমনটা কখনোই নয়। লে: কর্নেল উষা কিরণ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর আইনজীবী স্বামী জগৎ প্রসাদ ও পুত্র সুনীলের দেখাশোনা তিনিই করেন। সুযোগ পেলেই রান্না করেন, দশেরা-দেওয়ালি পালন করেন। কাজের প্রয়োজনে নবরাত্রির ব্রত করতে পারেন না। তিনি নাগাল্যান্ড, পঞ্জাব, কাশ্মীরে দীর্ঘদিন করে ছিলেন। নৌবাহিনীর প্রথম নারী অফিসার লেফটেন্যান্ট কিরণ শেখাওয়াতের কথা সকলেই জানি, তিনিও ঘর সংসার সামলে দায়িত্ব পালন করেছেন। সদ্য লেফটেন্যান্ট পদে যোগ দেওয়া দিল্লিবাসী আরতি দত্ত জানিয়েছেন, তিনি সিনেমা দেখতে, গান শুনতে এবং নাচতে ভালোবাসেন। তার নাচ ও গান যথেষ্ট ভাইরাল সমাজ মাধ্যমে। কয়েক লক্ষ তার অনুগামী। আরতি বলেন, প্রথম থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল ডিফেন্স অফিসার হবেন। সবটাই সুখের হয় না। হরিয়ানার সোনপথের পাখারি গ্রামের কলাদেবী গুর্জ্জর ছিলেন সেনাবাহিনীর নায়েব সুবেদার। প্রতিরক্ষা বিভাগের চাকরি না ছাড়ার অপরাধে তাঁর স্বামী লেখন তাঁকে খুন করে। আবার চারজন নারী (নিয়ম অনুসারে নাম লেখা হলো না) কঠোর অনুশাসন সহ্য করতে না পেরে ট্রেনিং চলাকালীন আত্মহত্যা করেছেন। তবে এই সব ছবি নারীশক্তির কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সেনাবাহিনী মানেই নিষেধের ঘেরাটোপের কারাগার এমনটা মনে করেন না কোনো নারী অফিসার। তবে নিয়ম অনুসারে কঠোর অনুশালন, নিয়মানুবর্তিতা, বিপদকে সঙ্গী করে চলা এইসব থাকবেই। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই তাঁরা জানেন কেবল নিছকই চাকরি নয়, দেশ সেবা করতেই যাচ্ছেন। দেশ সেবার বিনিময়ে কী পেলেন ভাবতেই চান না কেউ। তবে দেশবাসীর সমর্থন ও ভালোবাসা নিত্য সঙ্গী। নারী সেনারা বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, সীমান্তে তাঁরা সজাগ থাকবেন যাতে দেশের নাগরিকেরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। দশভুজার প্রতিমূর্তি এই নারী সেনারা সকলেই মনে করেন শত্রু দমনে তাদেরও এগিয়ে রাখা হোক। বিজয়ী হবেনেই। শেষকথা পশ্চিমবঙ্গের বিন্নাগুড়ি ক্যান্টনমেন্টের তিন নম্বর কোরের ইউনিট ফোরের সাফাইকর্মী বীণাদেবী গুরুং-এর কথা বলতেই হয়। তিনি তাঁর চাকরি জীবনের অনেক দিন কাটানোর পর সদ্য সিপাহি পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। নতুন প্রাপ্ত ইউনিফর্ম পরেই তিনি ইউনিট পরিচ্ছন্ন রাখেন। তিনি বলেন, দিনের প্রথম সূর্য ওঠার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সূর্যের সামনে থাকা দেশমাতার প্রতীক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় বিউগল বাজে, তখন সকলের সঙ্গে স্যালুট করার যোগ্যতা পেয়েছেন ইউনিটের সকলের প্রিয় দিদি আলিপুরদুয়ার গালর্স স্কুলের এই প্রাক্তন ছাত্রী। এই একটি মাত্র কারণে প্রতিদিন ভোর হওয়ার আগেই ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজ সেরে ইউনিটে চলে আসেন। তাঁর মতে জীবনের সকল প্রাপ্তি এটাই। মানব জন্ম সফল তাঁর। বলতেই দৃঢ়তায় চোখ উজ্জ্বল হয়ে আসে ভারতীয় সেনার নারী শক্তির এই দশভুজার।

(কৃতজ্ঞতা : লেফটেন্যান্ট জেনারেল টি এস প্রসাদ)

কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়ার কারণ চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শরীরের মধ্যে যখন অতিরিক্ত অ্যানড্রোজেন হরমোন তৈরি হয়, তখন নারী শরীরে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, ডিম্বাণু বের হয় না। ফলে গর্ভসঞ্চার ঘটে না। অন্যদিকে পুরুষ শরীরে অ্যানড্রোজেন হরমোনের আধিক্য ঘটলে শুক্রাণুর পরিমাপ কমে যায়। সন্তান চাইলেও মেলে না। মানুষের শরীরের এই অবস্থাকে বলে কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া। কনজেনিটাল হলো জন্মগত বা সহজাত। অ্যাড্রিনাল হলো উভয় বৃক্কের উপরের গ্রন্থি। হাইপারপ্লাসিয়া হলো কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি।

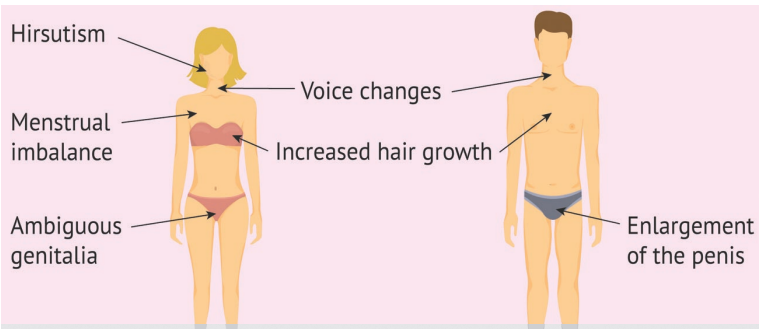

শরীরের এরকম অবস্থা হলে মানুষটি খাটো হতে পারেন। শরীরে অপছন্দের বিদঘুটে গন্ধ হতে পারে, অ্যাকনে বা ব্রণ হতে পারে, ঋতুস্রাব মাঝে মাঝেই বন্ধ থাকতে পারে বা একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অবাঞ্ছিত লোম হতে পারে। এই অবস্থায় মুক্তি পাওয়ার সস্তার চিকিৎসা তথা শ্রুশ্রূষার দারুণ উপায় বলেছেন নিউ ইয়র্কের মাউন্ট সিনাই স্কুল অব মেডিসিনের ডাঃ মারিয়া নিউ। তিনি বলেছেন, এরকম অবস্থার শ্রুশ্রূষা করতে হলে প্রথমে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিতে হবে। সেভেনটিন হাইড্রোক্সি প্রোজেস্টেরনের মাত্রাধিক্য। পাশাপাশি একটা জেনেটিক টেস্টও করা যেতে পারে। পরীক্ষার পর অল্প অল্প করে স্টেরয়েড ডেক্সামিথাসোন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। তিন মাস থেকে আড়াই বছরের মধ্যে অধিকাংশ উপসর্গই বিদায় নেবে।

ডাঃ নিউ-র বক্তব্য, সবার মধ্যে একাধিক উপসর্গ থাকে না, কারও কারও একটি উপসর্গ থাকলেও একই চিকিৎসায় এগোনো যায়। অতি উৎপাদনী অ্যানড্রোজেন নারী শরীরে অস্পষ্ট (দ্ব্যর্থবোধক) রহস্যময় দ্বিতীয় জননেন্দ্রিয়ও তৈরি হতে পারে। তবে অধিকাংশ চিকিৎসকই শরীরের এই জটিল অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক নন। পিরিয়ড তথা ঋতুস্রাব অনিয়মিত হলে যেমন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হয়, তেমনই কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়াও হতে পারে।

বয়ঃসন্ধির আগেও এরকম ঘটে অনেকের ক্ষেত্রে। সেসব মেয়ের ক্ষেত্রে আগেভাগে ঋতুস্রাব ঘটে এবং পরের দিকে ঋতুস্রাব অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। চিকিৎসকেরা একে অপরিণত বয়ঃসন্ধি ভেবে আসছেন।

নিউ জার্সির ওয়েস্ট ডেপ্টফোর্ডের জোয়ান সিট্রোনি ১৫ বছর ধরে কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়ায় ভুগছিলেন। তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়ে ডাঃ নিউ ধরে ফেলেন গলদটা। ডেক্সামিথাসোন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। দুই সন্তান দত্তক নেওয়ার পর শুরু হয়েছিল তাঁর। চিকিৎসার পর নিয়মিত ঋতুস্রাব হচ্ছে। বেশিরভাগ উপসর্গই দূর হয়েছে। এখন তাঁর বয়স ৩৮। এবারে তিনি গর্ভে সন্তান ধারণের কথা ভাবছেন।

তিনি জানিয়েছেন, 'যখন আমি বেড়ে উঠেছিলাম, তখন আমার কখনোই মনে হতো না, আমি মেয়েদের মতো। ডাক্তাররা বলেছিলেন, টেস্টোস্টোরোন হরমোন আধিক্যেই নাকি তেমনটি হচ্ছিল। যাক ১৫ বছর বাদে সঠিক নির্ণয় হলো, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম। পরিপূর্ণ মহিলা হতে পারলাম।'

টেরি নামে সাত বছরের এক মেয়ে, বয়স যখন তার ছয়, তখনই দেখা যায় বগলে ফিকে হলুদ তথা সোনালি রঙের লোম উঠেছে। সাত বছর বয়সে যোনিপিঠে হালকা লোম গজাতে শুরু করে। আগেভাগে বয়ঃসন্ধি তথা যৌবনোদ্গম হচ্ছে ভেবে এনডোক্রিনোলজিস্টের কাছে পাঠানো হয়। টেরির শরীরে কয়েক মাস ধরে লোম বেড়ে যেতে থাকে।

বছর খানেক বাদে হাড়ও দ্রুত বাড়তে থাকে। ক্লাসে একসময় সবচেয়ে ঢ্যাঙা মেয়ে হিসেবে পরিচিত ছিল যে, তার হাড়বৃদ্ধি হঠাৎ আটকে গেল। এতদিন ডাক্তাররা স্টেরয়েড দিতে চাননি, পরে দিতে বাধ্য হন। এরকম অবস্থায় পৌঁছানো বহু বালিকাকে গ্লুকোকরটিকয়েডস হরমোন দিয়ে, গ্রোথ হরমোন দিয়ে, ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

অ্যাকনের ভোগান্তি যাদের খুব হয়, অতি লোমশ হয়ে যায় যে মেয়েরা অর্থাৎ হিরসুটিজমের ভোগান্তি হয় যাদের, তাদের ক্ষেত্রেও এনডোক্রিনোলজিস্টের শরণাপন্ন হয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে উপসর্গ শনাক্তকরণের পরামর্শ দিয়েছেন ডাঃ মারিয়া নিউ। জানিয়েছেন, যাদের শরীরে আগেভাগে যৌবনোদ্গম ঘটেছে, শরীর অতি লোমশ, মুখেও অনেক লোম, শরীরে কটুগন্ধ, অ্যাকনের ভোগান্তি, প্রজনন সমস্যা, অনিয়মিত মাসিক, এরকম ক্ষেত্রে যখন প্রথাগত চিকিৎসায় কোনো ফল মিলছে না, তখন সেই মেয়ে বা মহিলা কনজিনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়ার ভোগান্তি ভুগছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। সেভাবেই চিকিৎসা দরকার।

অন্যদিকে নিউ হাইড পার্কের স্নাইডার চিলড্রেনস হসপিটালের শিশু এনজো-ক্রিনোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ ফিলিস ডবলিউ স্পাইজারের হুঁশিয়ারি, সবার ক্ষেত্রে গ্লুকোকরটিকয়েডস দিয়ে চিকিৎসা করানো ঠিক হবে না, ন্যূনতম উপসর্গ আছে মনে করলে, তবেই গ্লুকোকরটিকয়েডসে চিকিৎসা সফল হবে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □

‘ছাওয়া’—এক নৃশংস নিষ্ঠুর ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন

প্রবীর ভট্টাচার্য

মহারাষ্ট্রের খুলদাবাদে ঔরঙ্গজেবের কবর সরানোর কাল্পনিক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন ধরে দেশের সেকু-মাকু এবং তাদের দোসরদের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। জেহাদিরা নাগপুর-সহ বেশ কিছু শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। কী চায় এরা? বিদেশি, অত্যাচারী শাসক ঔরঙ্গজেবের প্রতি এদের এত আবেগ কেন?

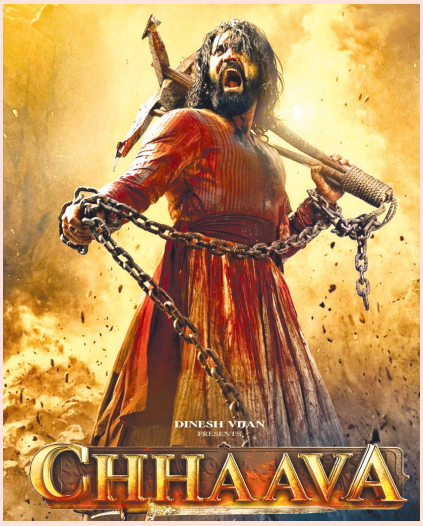

এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে দেখতেই হবে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ‘ছাওয়া’ ছবিটি। ঔরঙ্গজেবের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া এক মরাঠা যুবকের বীরত্বের কাহিনি। প্রবীণ মরাঠী লেখক শিবাজী সাওয়ান্তের উপন্যাস অবলম্বনে হিন্দি চলচ্চিত্র ‘ছাওয়া’ ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজের জীবন কাহিনি সারা দেশে আলোড়ন তুলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকশো কোটি টাকার ব্যবসা করেছে হিন্দি ভাষায় নির্মিত এই ছবিটি।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব ভেবেছিল হিন্দবী স্বরাজ দখল করতে মাত্র এক বছর সময় লাগবে। ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজের সিংহাসনে আরোহণের পরেই ঔরঙ্গজেব চলে আসে দাক্ষিণাত্যে। তখন মরাঠাদের চারিদিকে শত্রু। বিজাপুরে আদিল শাহ, গোলকুণ্ডা থেকে কুতুব শাহ, গোয়ায় পর্তুগিজ, রাজাপুরে ব্রিটিশেরা। এই সব কিছু ছাপিয়ে মুঘলদের বিশাল বাহিনী। ঔরঙ্গজেবের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় সাত লক্ষ। সেখানে ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজের সৈন্য মাত্র পঞ্চাশ হাজার। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরঙ্গজেব আদেশ দেয় শম্ভাজীর দুর্গ দখল করার। কিন্তু কোনো সেনাপতিই তাতে সফল হয়নি। নাসিকের কাছে একটি ছোট্ট দুর্গ দখল করতে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি শাহবুদ্দিন ফেলিজ বাদশার কাছে মাত্র দুদিন সময় চেয়েছিল। কিন্তু ৬ বছর ধরেও তা দখল করা সম্ভব হয়নি।

১৬৮৭ সালে ওয়াইয়ের যুদ্ধে প্রধান মরাঠা সেনাপতি হাম্বিররাও মোহিতে নিহত হন। এক নিকট আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৬৮৯ সালে সঙ্গমেশ্বরে মুকার্রম খানের বাহিনীর হাতে শম্ভাজী বন্দি হন। ঔরঙ্গজেব তার অসম সাহসিকতায় খানিকটা চমকিত ছিলেন। ভেবেছিলেন এই রকম এক যোদ্ধা যদি তার সেনাপতি হয়, তবে সমগ্র এশিয়া তার পদানত হবে। তিনি শম্ভাজীকে কলমা পরিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলেন। কিন্তু সিংহ শাবক শম্ভাজী তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। শম্ভাজীর উত্তর ছিল, ‘বার বার জন্মাবো, বার বার মরবো, কিন্তু হিন্দুধর্ম ছাড়বো না’। শম্ভাজী বলেছিলেন তুমি আমাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু আমার স্বপ্নগুলোকে মেরে ফেলতে পারবে না। শম্ভাজীর মৃত্যুর পর মরাঠারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে আসে এবং মুঘলদের ভীষণ লড়াই শুরু করে। এক বছরের মধ্যে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ঔরঙ্গজেবকে সাতাশ বছর এখানে থাকতে হয়েছিল। দিল্লিতে ফিরে যাওয়া তার আর হয়নি। মরাঠা হিন্দু সাম্রাজ্য দখল করা সম্ভব হয়নি।

ঔরঙ্গজেবের আদেশে গরম লাল লোহার শিক দিয়ে শম্ভাজীকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। তার জিভ কেটে নেওয়া হয়। পুণের কাছে ভীমা নদীর তীরে তার শিরশ্ছেদ করে দেহ টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ছত্রপতি শম্ভাজী, মুঘলবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকা উচিত। কিন্তু ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলিকেই এতদিন ঢেকে রাখা হয়েছিল। সেকু-মাকু এবং তাদের দোসরদের গাত্রদাহ এই কারণেই। কিন্তু সময় এসেছে এগুলির পুনর্মূল্যায়নের।

পরিচায়ক লক্ষ্মণ উতেকারের হিন্দি ছবি ‘ছাওয়া’ ইতিহাসের এই অনুচ্চারিত অংশগুলোই তুলে ধরেছে এক নৃশংস নিষ্ঠুর ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করেছে। সিনেমাটোগ্রাফি সৌরভ গোস্বামীর। ২০১৬ সালে উতেকারের ‘লাল বাগচি রানি’ সিনেমাটিও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সে তো সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক প্রতিবন্ধী মেয়ের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ‘ছাওয়া’ একেবারেই ভিন্ন মাত্রার। ছত্রপতি শম্ভাজীর চরিত্রে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা ভিকি কৌশলের অভিনয় মনে রাখার মতো। ‘সর্দার উধ্ম’ ছবিতে উধম সিংহের চরিত্রে অভিনয় দেখে আঁচ করা গিয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিঙে স্নাতক এই তরুণ অনেকটা পথ হাঁটার জন্য বলিউডে এসেছেন। যেশুবাই চরিত্রে দক্ষিণী সুন্দরী রশ্মিকা মন্দানার কথাও বলতেই হয়। অসামান্য ফোটোগ্রাফি, এডিটিং সব কিছু নিয়ে ‘ছাবা’ দর্শকদের সব প্রত্যাশা পূরণ করেছে। ছবিটি দেখতে দেখতে একটাই কথা মনে হচ্ছিল— যশোর নরেশ প্রতাপাদিত্যকে নিয়েও এমন ধারার ছবি বাঙ্গালি পরিচালকেরা কি ভাববেন? □

‘ছাওয়া’ এক ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

‘‘গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দি হইল
তুরাণি সোনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত
বাঁধি ল’য়ে গেল ধ’রে
দিল্লি নগর পরে।
বন্দা সমরে বন্দি হইল
গুরুদাসপুর গড়ে।
সম্মুখে চলে মোগল সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি—
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ পরে লোক নাহি ধরে
বাতায়ন যায় খুলি।
শিখ গরজয় গুরুজীর জয়
পরানের ভয় ভুলি।
মোগল ও শিখে উড়াল আজিকে-
দিল্লি-পথের ধূলি।’’

এরপরেও শেখানো হয় দেখানো হয়, মুখস্ত করানো হয় মুঘল আমল ভারতের স্বর্ণযুগ। মুঘল আমলের দ্য গ্রেট কাকে বলা হয়? মুঘল আমলেই ভারত সর্বধর্মসমন্বয়ের পাঠ পড়ল! কী যশ, ভাগ্য মুঘল আমলের, ভাগ্যই বটে! কারণ ভারতের ইতিহাসের সিলেবাস রচয়িতা, মূলত ইসলাম প্রীতিধন্য, সেকুলার রোমিলা থাপার গোত্রীয় ঐতিহাসিকরাই ইতিহাসের ন্যারোটিভ গঠনের ‘পাওয়ার অব অ্যাটর্নি’ সুখের সঙ্গে উপভোগ করেছে। মুঘল আমলে ধরে নিলাম কিছুতো সৃষ্টি হয়েছে। জো হুজুর বলতে বলতে রোমিলা থাপারপন্থীরা ‘অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ, ইতিহাস বলেছেন। লিখেছেন। এটা আর বলেননি যত সৃষ্টি, তা তৈরি হয়েছে বিধ্বস্ত হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধ বা কোনো না কোনো ভারতীয়

ইমারতের ওপর। তারা তা গড়েছে ধ্বংসযজ্ঞের উল্লাসে! তাদের ভোগের জন্য যা যা শোভা পায় তাই তারা লুঠ করেছে। ইব্রাহিম লোদি থেকে ঔরঙ্গজেব— ধন সম্পদ, মন্দির, ধর্ম, বিগ্রহ, নারী, জমি, এমনকী ভারতের চিরন্তন নৈতিকতাকেও তারা লুণ্ঠন করেছে, যুদ্ধনীতিরও মানহানি ঘটিয়েছে।

তারা শুধু দখল ও লুঠতরাজ করেনি, গ্রাস করেছে জাতির মর্যাদা। ভারত আত্মাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কলুষিত করেছে। স্যার যদুনাথ সরকার রচিত সেই সত্য ইতিহাস থেকে দিনের পর দিন মানুষকে- পাঠককে-ছাত্রকে দূরে রাখা হয়েছিল। এখন বিষম হেঁচকি উঠছে— ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নে যখন 'ছবি' তৈরি হচ্ছে। সিনেমা যে সবচেয়ে দ্রুত গণমাধ্যম, সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ সহজ গণমাধ্যম। কাশ্মীর ফাইলস্, কেরালা স্টোরিতে কী অসহ্য উত্তেজনা একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর এবং রাজনৈতিক মহলেরও। আরও বেশি উত্তেজনার, বলা ভালো, অস্বস্তির স্বেদ বইছে 'ছাওয়া' ছবি মুক্তির পর থেকেই। এ কেমন রাগিণী বাজল! ছত্রপতি শিবাজী, তাঁর দুর্দমনীয় তেজ, জেদ, মেরুদণ্ড, প্রতাপ প্রবাহিত ছিল পুত্র শম্ভাজীর চরিত্রের অণু পরমাণুতে। তাঁকে আদর করে শম্ভুজীও বলা হয়। তিনি ছিলেন অনমনীয়, অজেয়; অত্যাচারী ঔরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর অত্যাচারেও। তাঁর বাহুবল, পরাক্রমী চরিত্র তাঁকে ইতিহাসে প্রকৃত 'দ্য গ্রেট' আখ্যা দিতেই পারত। কিন্তু এতদিন তিনি ছিলেন ওই এককোণে। আসল কথা শম্ভাজীর আদর্শ রাষ্ট্রচেতনা এই ইকোসিস্টেমের মাথাব্যথা নয়। গেল গেল রব উঠছে— কারণ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে। ঔরঙ্গজেব— যাকে সন্ন্যাসী রাজা মার্কা এক রূপে দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কংগ্রেস বাম ও ইসলামপন্থী ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক দলগুলি দশকের পর দশক ধরে। এই সত্যনিষ্ঠ ছবি তাদের ফেলেছে মহাবিপদে। ঔরঙ্গজেবের পর্দা ফাঁস হলো ছবিটি রূপালি পর্দায় ফুটতেই। এক ঘৃণ্যতার নাম ঔরঙ্গজেব।

ঠিক যে কারণে শিবাজীকে হিন্দু হৃদয় সম্রাট বলে মানতে অসুবিধা সেকুলারদের, আরও বেশি তাদের বাধছে শম্ভাজীকে হিরো বলতে। কারণ তাতে ঔরঙ্গজেবের পাশবিক রূপ প্রতিষ্ঠিত হবে। ঔরঙ্গজেবের কবরটিও দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ হোক, এমনই চাহিদা অগণিত রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন মানুষের। তা হতে গেলে অবশ্যই আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার নির্দিষ্ট প্রশাসনিক স্তর অনুযায়ী অনুসৃত পদ্ধতিতেই হবে। ঔরঙ্গজেবের রূপ একটা ছবিতে প্রকাশিত হতেই দেশের বিভিন্ন পকেটে অশান্তি ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা শুরু।

দেখে নিই এক ঝলকে সেকুলারদের ন্যারেটিভের সন্ন্যাসীরাজা কতোটা হিন্দুবিদ্বেষী ও ভারত বিরোধী ছিল। ১৬৬৯ সালের ৯ এপ্রিল, ঔরঙ্গজেব আদেশ দিল— সব প্রদেশের যত মন্দির এবং সেই চত্বরে যত শিক্ষাঙ্গন রয়েছে তা ধ্বংস করার (যদুনাথ সরকার, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯৪৭, পৃ. ৮১)। ১৬০৬, ২০ নভেম্বর ফরমান জারি হলো— হোলি বন্ধ। বাদশার হুকুম (রাম শর্মা, দ্য রিলিজিয়াস পলিসি অব মুঘল ইম্পিরিয়ার্স, অক্সফোর্ড, ১৯৪০, পৃ. ১৪৯)। রাম শর্মার রেফারেন্সেই পাওয়া গেছে ২৩ জুন, ১৬৯৪ আজমীরের হিন্দু মন্দিরটি ধ্বংসের হুকুম আসে দরবার থেকে। 'দরদি' ঔরঙ্গজেব ১৬৪৫-এ গুজরাটে চিন্তামন মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করল। বন্ধ হলো দ্বারকাতে হিন্দুদের পূজা। চিতোরের ৬৩টি হিন্দু মন্দির তিনিই ধ্বংস করলেন। বুন্দেলখণ্ডের শিবমন্দির একই ভাবে ধ্বংস। গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে হামলা। শাসানি এসেছিল যদি কেউ মন্দিরে পূজা দেয়— মন্দিরের অস্তিত্বটাই থাকবে না (যদুনাথ সরকার, হিস্ট্রি অফ ঔরঙ্গজেব, ১৯২৮, পৃ. ২৮৯)।

১৬৬৫ সালের ২০ নভেম্বর, মিরাটে ফরমান জারি হয়েছিল, গুজরাটের কিছু কিছু

অঞ্চলে স্থানীয়রা আবার মন্দির মেরামত করে যাতায়াত করছে। আদেশ এটাই বিগত সময়ের ধ্বংস হওয়ার পর পুনর্নির্মিত মন্দির এবং বর্তমানেরও যত মেরামত হওয়া মন্দির রয়েছে সব ধ্বংস করা হোক। ধ্বংস হলো সৌরাষ্ট্রের মন্দির (সূত্র : রাম শর্মা)। ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ভারত আত্মাকে লুঠ করেছে। লুটপাট চলেছে গুজরাট থেকে কোচবিহার পর্যন্ত। ১৬৬১-র ১৯ ডিসেম্বর মীরজুমলা কোচবিহার আক্রমণ করল। বিচারের আসনে তখন বসল মহম্মদ শাদিক। নির্দেশ এল মন্দির ধ্বংস করে তার ওপর মসজিদ নির্মাণের (যদুনাথ সরকার, হিস্ট্রি অব ঔরঙ্গজেব পৃ. ২৮১)।

একে একে মুঘলসেনা বিধ্বস্ত করেছে কটক, মেদিনীপুর থেকে খাণ্ডালা। বাদ যায়নি পবিত্র মথুরাও। ১৬৭০ জানুয়ারিতে আদেশ দিল মথুরা মন্দির ধ্বংসের। মথুরার মণিমাণিক্যখচিত কৃষ্ণমূর্তি ইসলামি লুঠেরার দল নিয়ে গেল আগ্রায়। জাহনারা মসজিদের নীচে তা রইল (যদুনাথ সরকার)। ১ জানুয়ারি ১৭০৫ পান্ধারপুর, ১৬৬১-তে পালামৌ, সাতারা, ১৬৭০-এ উজ্জয়িনী, ১৬৮০-তে উদয়পুর, মেবার, সোমেশ্বর, ১৬৯৩-এ বাদনগর চলেছে ঔরঙ্গজেব নির্দেশিত মন্দির ধ্বংস, হত্যালীলা। চলেছে হিন্দুদের ওপর অস্থির উপদ্রব। আক্রমণ করতে ছাড়েনি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরও। এঁটে ওঠেনি নাগা সন্ন্যাসীদের প্রতিরোধ। ধ্বংস করেছে বারাণসীর গোপীনাথ মন্দির।

ঔরঙ্গজেব অতি অবশ্যই ইতিহাসে স্থান পাক। পর্বের পর পর্ব বিস্তারিত তথ্য আলোচনা হোক তার ধ্বংসলীলার। নতুন ভারতের দায়িত্ব কেবলমাত্রই সড়ক নির্মাণ নয়, ইতিহাসের সড়কে যত মিথ্যাচার, হিন্দুর মাটিতে যত ধ্বংস-বর্বরতা-তাণ্ডবের অধ্যায় ঘটিয়েছে ইসলামিক আগ্রাসন, তার দলিল তৈরি এক গুরুদায়িত্ব। চলচ্চিত্র পালন করেছে সে দায়িত্ব— 'ছাওয়া' পালন করল সে দায়িত্ব। যারা চিলচিৎকার করছে তারা তবে প্রতিটি দৃশ্য ঘটনার বিরুদ্ধেই তাদের 'আসল সেকুলার' ইতিহাস যোগে আর একটা কাউন্টার ছবি বানাক। আছে তাদের সে ইতিহাস রেফারেন্স? নেই। নেই বলেই তাদের মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরির পাঠশালা বানাতে হয়। এখনও বলতে পারে স্যার যদুনাথ সরকার বড্ডো একপেশে!

সত্যিই তো— স্যার যদুনাথ সরকারের মতো বরেণ্য ইতিহাসবিদ মুঘলদের কিছুই ভালো দেখলেন না। তবে আরও কিছু তথ্যসূত্র দেওয়াই যাক। কেমন ছিল মুঘল? খুব সদ্য ২০০৬, ভারতের আনবায়াসড ইতিহাস পড়ে এবং অতি অবশ্যই 'ছাওয়া'র মতো ছবি না দেখেই ঐতিহাসিক জনসন উল্লেখ করলেন, 'Muslim invaders broke and burned everything beautiful they came across in Hindustan' এবং যে মুঘল ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গালগল্প দেয় কিছু বামপন্থী ন্যারেটিভ, তাকেও মান্যতা দিলেন না জনসন। হাইব্রিড নির্মাণ কী? ধর্মীয় সহিষ্ণুতা? হাস্যকর! আসলে বর্বর দস্যুদের চূড়ান্ত ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ওগুলো— almost every 'hybrid' expression that has come down to us surviving in the form of the conquest mosque is a religious declaration, through architectural continuity of Muslim superiority over Hindu heathenry.'

উল্লেখ করা হলো 'mosques that are all built on the sites of dismantled temples and employ recut columns and other spolia taken from the destroyed monument' (Wagoner and Rice, 2001, page-90)। একই সুরে একই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক তথ্য যোগে উল্লেখ করে, প্রশ্ন : কারা মুঘল? উত্তর : 'the evils of idolatry and polytheism' (Welch and Crane, 1983, page-124)। 'ছাওয়া' বা এই ধরনের যত ছবি, সিরিয়াল হবে ততবার তারা যে evil তা বারবার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের বারবার পড়ার হয় ওরা কত শৈল্পিক, কত সৃষ্টি করেছে, কত সমন্বয় সাধন করেছে। এবার বারবার পড়ার-দেখার-শোনার, দরকারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পালা— কেন ওরা evil তা দেখানোর।

ঐতিহাসিক মুনীলাল উল্লেখ করেছেন, 'Aurangazeb entered Prince Azam with the campaign to subjugate Shambhji... En route, the prince carried out the Emperor's instructions to 'raze' to the ground such strongholds of infidelity (i.e, temples) as cross your way and to build in their place grandiose house of God (mosques) such as would do credit to our mission'

তাই শম্ভাজী যখন সেই বর্বরতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করেন তখন ঔরঙ্গজেবের পশুত্ব কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা বোধহয় সিনেমাটা না দেখেও অনুমান করা যায়। হিন্দু আর্তনাদের মাঝে শম্ভাজীর সিংহ গর্জন। তাঁর বীরত্বের পাশে মুঘল বর্বরতা, লাম্পট্যকে সত্যিই evil দেখাবে। রোমিলা থাপারদের ব্যাখ্যা শম্ভাজী বা কোনো হিন্দু শিখ বীরের জয়ধ্বনি করার বোকামি করেনি। এক জয়ধ্বনি মানেই মুঘল খলনায়কত্ব ধরা পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। রোমিলা থাপার বাহিনী ২০২০-তে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনকিলাব' নামক বই প্রকাশ করেন। ওরা জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবোধের নানান সব ব্যাখ্যা রেখেছেন তাতে। কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধের উল্লেখ নেই যেখানে ইসলামিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সেই সব ভারতমায়ের বীররা গৈরিক ধ্বজা ধরেছিল। গালভরা দাঁতভাঙা কতরকম জাতীয়তাবোধের ব্যাখ্যা, কিন্তু রাষ্ট্রবোধে যে শিবাজী-শম্ভাজী-রাণা প্রতাপ-গুরুগোবিন্দ সিংহকে দরকার তারা কোথাও বলেননি। এই স্কুল অফ থট্-এর কাছে তাই 'ছাওয়া' একটা চ্যালেঞ্জ। এই ধরনের যে কোনো চলচ্চিত্রই বড্ডো তিক্ত চ্যালেঞ্জ। ওরা ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা দেয় কিন্তু রেফারেন্স দিতে পারে না। ঔরঙ্গজেবের কবর কোন যুক্তিতে দর্শনীয়? খুব সাধারণ কিন্তু যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন নয় কি? আমাদের দুর্ভাগ্য এটাই যে, ঔরঙ্গজেবের কবর আজও একটি সংরক্ষিত স্থান। কিন্তু পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের উয়ারী গ্রামে বটুকেশ্বরের পৈতৃক বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছেন ভগত সিংহ। এই বাড়িতে ১৫ দিন ছিলেন তিনি। তা আজ পরিত্যক্ত, জরাজীর্ণ। ঔরঙ্গজেবের কবরটি দর্শনীয়! সেকুলার কমিউনিস্টদের কাছেই জিজ্ঞাস্য, ওদের ন্যাশনালিজম কি ঔরঙ্গজেবের কবরেই কবরস্থ?

ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস নিষিদ্ধ নিষ্ঠুরতার। হিটলার ওর কাছে সত্যিই ছেলেমানুষ। সেকুলার ন্যারেটিভে তিনি ছিলেন Whitewashing Tyrant! এবার ক্ষান্ত হোক সে ন্যারেটিভ। ছাওয়া দেখে ইতিহাস শেখা যাবে? —সেকুলারদের বাঁধা প্রশ্ন। উত্তর হলো— শেখা যাবে না। সিনেমার কাজ ইতিহাস শেখানো কেন হবে! তার জন্য পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র, চর্চাকেন্দ্র সব আছে। সেসব থেকে শিখে ইতিহাস উদ্ধার করে 'ছাওয়া' তৈরি। ছাওয়া— ভুল ইতিহাসটাকে লালকালিতে কাটল কেবল। সেকুলারদের পশমের টিয়া যে রচনানৈপুণ্য দেখাত তার আসল সত্য অগোচর ছিল। 'ছাওয়া' তা গোচরে আনল। তা অনেকের গায়ে লাগছে। লাগুক। জাতীয় কর্তব্য প্রতিষ্ঠাতে কোনো আপোশ হতে পারে না। ■

রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমে আলোচনাসভা

গত ২২ মার্চ হুগলী জেলার রিষড়া-স্থিত প্রেম মন্দির আশ্রম প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষের জ্ঞান-গরিমা-ঐতিহ্য বিষয়ক একটি রাজ্যস্তরীয় আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনসভার শিরোনাম ছিল— 'Indigenous Knowledge on Science and Technology (IKST-2025)'। আলোচনাসভার আহ্বায়ক ছিলেন ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানান ধারায় বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহু স্বীকৃত অবদান ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রবুদ্ধ, প্রথিতযশা অধ্যাপক ও গবেষকরা। শ্রোতা ও দর্শকাসনেও ছিল চাঁদের হাট, ছিল বিদ্যার্থী ও মন্দিরের ভক্তমণ্ডলীর উজ্জ্বল উপস্থিতি।

প্রেম মন্দির জনকল্যাণ সমিতি এবং দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন প্রেম মন্দির আশ্রমের সহ-অধ্যক্ষ পূজ্য শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। স্বাগত ভাষণ দেন প্রেম মন্দির আশ্রমের সম্পাদক পূজ্য শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। উদ্বোধনী সত্রে উপস্থিত ছিলেন পূজ্য শ্রীমৎ দয়ানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্বটি সঞ্চালনা করেন ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায়।

উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠিত হয় দু'টি বৌদ্ধিক সত্র। প্রথম সত্রের বিষয়বিন্দু হিসেবে নির্ধারিত ছিল জীববিদ্যা সংক্রান্ত লৌকিক জ্ঞান ও পরম্পরা। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কালাংশে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মানবেন্দ্র রায়। তারপর কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার কলেজের অধ্যাপক ড. অভিজিৎ গলুই, আরসিসিআইআইটি-র অধ্যাপক ড. তথাগত দেব ও ড. কাঞ্চন কুমার পাত্র একে একে তাদের অপূর্ব গবেষণা-চয়ন-রূপ পুষ্প দিয়ে জ্ঞানের মালা গাঁথতে থাকেন।

দ্বিতীয় কালাংশের বিষয় ছিল গণিত ও মৌলবিজ্ঞান। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শিবপুর আইআইইএসটি-র প্রাক্তন নিবন্ধক ড. দীপঙ্কর চক্রবর্তী। এখানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, আরসিসিআইআইটি-র অধ্যাপিকা ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায় এবং ড. দীপঙ্কর চক্রবর্তী। তথ্য নিবন্ধীকৃত করেন অনির্বাণ দে। বিভিন্ন সত্রে চারুবাক সঞ্চালক ছিলেন মিলন খামারিয়া, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী ও সুশান্ত মজুমদার। আগ্রহী দর্শকদের নানান প্রশ্নের জবাব দেন আমন্ত্রিত বক্তা ও অতিথিরা।

আশ্রম সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ জানান, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার উত্তরাধিকার আমরা ভারতবাসী বহন করে চলেছি। তাই এই বিষয়গুলি জানার, সহজভাবে বোঝার অধিকার আমাদের সকলের, এই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। আশ্রম কর্তৃ পক্ষ বছরে দু'টি এইরকম আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করবে। আশ্রমের মুখপত্র 'প্রেম প্রবাহ' পত্রিকার সম্পাদিকা ড. শতরূপা চট্টোপাধ্যায় জানান, প্রেম প্রবাহ পত্রিকায় এখন থেকে নিয়মিত জ্ঞান পরম্পরা বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হবে। এছাড়া এই সেমিনারে যে বক্তব্য উঠে এসেছে, সেগুলি নিয়ে আগামীদিনে প্রেম প্রবাহ পত্রিকায় একটি মনোগ্রাহী প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

আশ্রম সম্পাদকের করকমলে 'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির'-এর নতুন লোগো উন্মোচিত হয়। লোগোটির চিত্রাঙ্কন করেছেন শিল্পী শীর্ষ আচার্য। দেশের মাটির পক্ষে মিলন খামারিয়া জানান যে, অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। অনুষ্ঠানকক্ষ পরিপূর্ণ ছিল। এদিন সকালে বৃষ্টি হয়। আবহাওয়া ভালো থাকলে হয়তো আরও অনেকে আসতেন। আয়োজক সংগঠনের পক্ষে ড. কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, এইরকম অনুষ্ঠান আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একত্রে আরও অনুষ্ঠিত হবে। ভক্তির পাশাপাশি বিজ্ঞানেও আপ্লুত হতে চায় ভক্তরা। এই বার্তাটি সমাজের কাছে একটি বিশেষ উদাহরণ হয়ে থাকবে যে, ধর্মস্থানে বিজ্ঞান আলোচনা এবং ভারত-গৌরব সম্পাদনী সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

মুরারীপুর শাখায় বীর প্রশান্ত মণ্ডলের বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মুরারীপুর শাখায় বীর প্রশান্ত মণ্ডলের বলিদান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৮৪ সালে শাখা চলাকালীন কমিউনিস্ট গুন্ডাদের আক্রমণে সঙ্ঘস্থানেই প্রশান্ত মণ্ডল মৃত্যুবরণ করেন। প্রতি বছরের মতো এবারও মুরারীপুর শাখায় তাঁর বলিদান দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়। এদিন জেলার বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে হিলি খণ্ডের বিভিন্ন শাখা থেকে স্বয়ংসেবকরা মুরারীপুর সঙ্ঘস্থানে সমবেত হন। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য গোবিন্দ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ সহপ্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য অঙ্কুর সাহা ও প্রদীপ সাহা, দিনাজপুর বিভাগ সঙ্ঘচালক অপূর্ব কুমার দাস, বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ রাজবলী পাল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মন, জেলা কার্যবাহ শুভঙ্কর নাথ।

উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্বক্ষেত্র সামাজিক সদ্‌ভাবনা প্রমুখ গৌতম কুমার সরকার, অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়, কিষাণ সঙ্ঘের কোচবিহার বিভাগ সংগঠন সম্পাদক তথা হিলি খণ্ডের একসময়ের প্রচারক মহেশ বর্মন, আরোগ্য ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক অমিয় মাহাত। এদিন বিকেলে সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবকরা ছাড়াও এলাকার বহু সঙ্ঘানুরাগী মানুষ ও মা-বোনেরা হুতাত্মা প্রশান্ত মণ্ডলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। স্মৃতিচারণ করেন মুরারীপুর শাখার স্বয়ংসেবক বিনয় সরকার, ধীরেশ তালুকদার এবং অধুনা শিলিগুড়ি নিবাসী মনোরঞ্জন মণ্ডল।

শেষে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে পথনির্দেশ করেন বিভাগ সঙ্ঘচালক অপূর্ব কুমার দাস। সঙ্ঘের প্রার্থনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। স্মরণসভা পরিচালনা করেন হিলি খণ্ড কার্যবাহ রঞ্জন মালী।

সংস্কৃতভারতীর সমীক্ষা যোজনা বৈঠক

গত ২২ ও ২৩ মার্চ কলকাতা-স্থিত বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থানে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃতভারতীর দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সমীক্ষা যোজনা বৈঠক। প্রান্তের সভাপতি অধ্যাপক তন্ময় কুমার ভট্টাচার্য তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে গত একবছরে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে সংস্কৃতভারতী কী করতে পেরেছে সেই সমীক্ষা তুলে ধরে আগামী একবছর কার্যবৃদ্ধিতে সংস্কৃতভারতীর কী করণীয় সেই বিষয়ে সকল কার্যকর্তাদের নিকট গভীর চিন্তনের জন্য আহ্বান করেন। যোজনা বৈঠকে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। আগামী এক বছর সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির, গীতা শিক্ষণ কেন্দ্রম, পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্ যোজনায় শিক্ষার্থী সংগ্রহ, বালকেন্দ্রম্ অর্থাৎ শিশুদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কৃতপ্রেমীদের নিয়ে কীভাবে সংস্কৃতচর্চার কাজ বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়ে প্রতিটি জেলার কার্যকর্তারা জেলা অনুসারে বিশেষ চর্চা করেন।

দু'দিনব্যাপী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চেন্নাই থেকে আগত সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় প্রশিক্ষণ প্রমুখ শ্রীরামনারায়ণ মহাদেবন। সকল কার্যকর্তাকে স্থানীয় স্তরে সপ্তাহে একদিন কমপক্ষে এক ঘণ্টার জন্য সংস্কৃতপ্রেমীদের আহ্বান করে একটি মিলিত আড্ডা বা সাপ্তাহিক মিলন, অর্থাৎ 'সংস্কৃতচর্চা কেন্দ্রম্' করার জন্য তিনি উৎসাহ দেন। সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ সংস্কৃতভারতীর কার্যবিস্তারের জন্য সংস্কৃতপ্রেমীদের, বিশেষভাবে যুবক-যুবতীদের সংগঠনে যুক্ত করার জন্য বৈঠকে উপস্থিত কার্যকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। আগামী এক বছরের যোজনা নিমিত্তে প্রতিমাসে সংস্কৃতভারতীর নিয়মিত কাজের জন্য বার্ষিক দিনপঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার নির্মাণ করা হয়। প্রতিনিধিদের অনেককেই নতুন কার্যদায়িত্ব দেওয়া হয়। বৈঠকটি পরিচালনা করেন সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সম্পাদক সন্তু দত্ত।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

কাটোয়ায় সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠ এবং মহাকুম্ভে অংশগ্রহণকারী পুণ্যার্থীদের সংবর্ধনা

গত ২৩ মার্চ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতির উদ্যোগে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান। সমিতির অন্যতম কর্ণধার পূর্ণেন্দু দত্ত বলেন যে, এদিন কাটোয়া শহরের ঘোষেশ্বরতলা শিবমন্দির প্রাঙ্গণে সারাদিনব্যাপী এই মহতী অনুষ্ঠান হয়। ছিল প্রসাদের আয়োজনও। প্রচুর মানুষ গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সেই সঙ্গে মহাকুম্ভে অংশগ্রহণকারী কাটোয়ার পুণ্যার্থীদের বিশেষ সম্মান জানানো হয়। প্রত্যেককে গলায় মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে সকলকে মানপত্র দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, আচার্য সঞ্জয় শাস্ত্রী, সোমনাথ ব্রহ্মচারী ও ইসকনের ত্রিভঙ্গ প্রভু স্বামী রাধাশঙ্কর মহারাজ। এছাড়াও ছিলেন অভিনেতা কৌশিক রায়। সকাল ন'টায় সিংহাসনে 'গীতা' নিয়ে বাদ্যবাজনা সহকারে একটি বড়ো শোভাযাত্রা কাটোয়া শহরে পথ পরিক্রমা করে। শহরের মানুষ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি দিয়ে উৎসাহ দেন। শোভাযাত্রা বেলা ১০টা নাগাদ অনুষ্ঠানমঞ্চে এসে পৌঁছালে শুরু হয় পূজাপাঠ ও গীতা মহাযজ্ঞ। চলতে থাকে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান। মূল মঞ্চে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীরা গীতার শ্লোক পাঠ করেন। তা শুনে এবং হাতে গীতা নিয়ে উপস্থিত ভক্তরা সমস্বরে তা পাঠ করতে থাকেন। প্রসাদ গ্রহণের জন্য ভক্তদের লম্বা লাইন পড়ে যায়। বিকালে শুরু হয় ধর্মালোচনা। সন্ধ্যায় ছোটোদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে। রাতে রাধাশঙ্কর মহারাজের ভজন সংগীত এলাকার পরিবেশ ভাবগম্ভীর করে তোলে। কাটোয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতির সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের কাটোয়া শহরে এসেই সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়েছিলেন। অথচ, আমাদের শহরে তাঁকে ঘিরে বিশেষ কোনো উৎসবের আয়োজন করা হয় না। তাই আমরা গত তিন বছর ধরে সাড়ম্বরে সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান করে আসছি। এতে এলাকার বহু মানুষ অংশগ্রহণ করায় আমরা খুবই খুশি। সেই সঙ্গে কাটোয়া থেকে মহাকুম্ভে অংশগ্রহণকারী পুণ্যার্থীদেরও বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে।'

রাজপুত আর্য ক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন

গত ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ রাজপুত আর্য ক্ষত্রিয় সমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো সেলিমপুর পল্লী স্পোর্টস্ অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভামঞ্চে। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজপুত আর্য ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি প্রদ্যোৎ সিংহরায়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মানব কল্যাণ, চারুকলা, শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের অধিকারী রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শিক্ষাবিদ ড. মীনাক্ষী রায়, তেনজিং নোরগে পুরস্কারপ্রাপ্ত পর্বতারোহী বসন্ত সিংহরায়, সেনাবিভাগের প্রাক্তন বিশিষ্ট চিকিৎসক সৌমিত্র সিংহরায়, সমাজসেবী ভাস্কর সিংহরায়কে সমাজের উজ্জ্বল রত্ন হিসেবে বরণ করে নেওয়া হয়। সম্মেলনে বিগত দিনের কাজের পর্যালোচনা ও পরবর্তী বছরের কার্যক্রম স্থির করা হয়। বসন্ত সিংহরায়কে পদ্মসম্মানে ভূষিত করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাবও সম্মেলনে গৃহীত হয়। সমাজের সর্বস্তরের দুঃস্থ ও পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করা হয়।

কেশব ভবনে ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ আয়োজিত বার্ষিক চিকিৎসক সম্মেলন

গত ২৩ মার্চ ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ আয়োজিত ৩১তম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় কলকাতা মানিকতলাস্থিত কেশব ভবনের সভাকক্ষে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১০০ জন হোওিপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। হোমিওপ্যাথি সমাজের রাজ্য সভাপতি ডাঃ সুকুমার মণ্ডল ভারতমাতা ও মহাত্মা হ্যানিম্যানের প্রতিকৃতিতে পুষ্প নিবেদন করে সম্মেলনের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি ডাঃ নির্ঝর অধিকারী ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ দিলীপ দে। স্বাগত ভাষণ দেন ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের কার্যকরী সভাপতি ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু। তিনি ভারতীয় হোমিওপ্যাথি সমাজের মূল আদর্শ যে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি, ভারতীয় আদর্শ ও পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সেবা মানসিকতা, তাকে অবলম্বন করে সমস্ত চিকিৎসককে এই সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি পূর্বক্ষেত্র প্রজ্ঞা প্রবাহের সংযোজক অরবিন্দ দাশ। সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে 'পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে হোমিওপ্যাথির ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এবং ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাদের কার্যকরী সদস্য ডাঃ গোপাল কর। বিজ্ঞান সভা 'Deplorable disease and its homoeopathic approach & CKD disease and homoeopathic Treatment' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের পূর্বতন সম্পাদক ডাঃ আশিস কুমার মণ্ডল, ডাঃ বিশ্বজিৎ বাসু এবং হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক ডিএন দে।

সম্মেলনে জেলার সক্রিয় কার্যকর্তাদের এবং বিভিন্ন কলেজের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন ভারতীয় হোমিওপ্যাথি সমাজের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ বর্ণালী দে।

ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় 'ক্রীড়া জ্ঞান পরীক্ষা'য় এবছর পূর্বক্ষেত্র থেকে চতুর্থ পুরস্কারে প্রথম হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র সায়ন মাইতি। গত ২৬ মার্চ কলকাতা ক্রীড়া ভারতীর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে সায়ন মাইতির হাতে ১১ হাজার টাকার চেক তুলে দেন ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ সম্পাদক মধুময় নাথ এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল সরকার। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মহানগরের সহ সম্পাদিকা কিরণ চৌরাশিয়া, কলকাতা মহানগর সংগঠন সম্পাদক আশিস পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ মাতৃশক্তি প্রমুখ ঈষাবেলা মুখার্জী এবং বিশিষ্ট ফুটবলার দীপ দে।

সেবাধর্মের মূর্তপ্রতীক
বাবা কালীকমলিওয়ালা

শেখর সেনগুপ্ত

রক্ষণশীল সূর্যের এটা তড়িঘড়ি ঘটানো কোনও ইচ্ছাকৃত বিচ্যুতি নয়, প্রকৃতির কোনও আকস্মিক বিরূপতাও নয়; এরকম এখানে প্রায়শ ঘটেই থাকে, যাকে ঐশ্বরিক স্যানিটাইজার দিয়েই একমাত্র মুছে ফেলা সম্ভব। প্রথম বেলায় যা ছিল ঝকঝকে হাসিমুখ, মধ্যবেলায় সেটাই ধূসর-ধূসর অন্ধকার, বাতাসও চেঁচিয়ে কাউকে হুঁশিয়ার করে না। কারোর কিছু খোয়া গেল বলেও অভিযোগ নেই। তবুও কেন যেন সবকিছু ঠিকঠাক থাকে না। মনে ভয় জাগে, বুঝি কোনো করুণদশা এগিয়ে আসছে ধীরলয়ে। যিনি এই পরিবেশকে চেনেন না তার সারা দেহে তরঙ্গ খেলে যেতেই পারে। বাতাসের কাছে মারধোর খেয়ে আনকোরা ধুলো, বালি, পাথরকুচি সমানে ঢুকছে এবং যথাকালে বেরিয়েও আসছে প্রতিটি গুহা থেকে। এ বড়ো দুর্লভ দৃশ্য। সমতলবাসীর ফুরফুরে মনে তখন হরেক কিসিম অনুভবের আনাগোনা। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রিরও যে কত নীচে, তার সঠিক হিসেব দিতে পারেন কেবল হয়তো একজনই, তিনি স্বয়ং শিব। তথাপি নবীন সন্ন্যাসীর কথঞ্চিৎ চাঞ্চল্যও নেই। ভ্রূক্ষেপও নেই। তিনি পরমানন্দে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসে দাঁড়ালেন হৃষীকেশের সেই ভারতখ্যাত অন্নছত্রে। এখানে নিখরচায় কেবল আহার মেলে না, সাময়িক আশ্রয় নিতে চাইলেও আপত্তি করবেন না কেউ। কার বদান্যতায় হৃষীকেশের মতো দুর্গম স্থানে এমন ব্যবস্থাপনা? আপনি এখানে যাকেই এই প্রশ্নটি করবেন, তাঁর হাতের পাতায় লেখা রয়েছে একটিই মাত্র নাম—বাবা কালী কমলিওয়ালা। আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী তীর্থপ্রেমিকদের অন্তরেও গাঁথা রয়েছে এই একটাই নাম। বয়সে নবীন, হৃদয়ে প্রবীণ, সন্ন্যাসী পর্যটক স্বামী বিবেকানন্দও একাধিক জনকে প্রশ্ন করে শুনতে পেয়েছেন সেই একটিই নাম।

বাবা কালীকমলিওয়ালা শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক। শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন লীলা সংবরণ করেন, কালীকমলিওয়ালা তখনও বহাল তবিয়ত। বছরের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটাতেন হৃষীকেশেই। কালেভদ্রে হরিদ্বারে যান আপন বাসনাসিদ্ধিকে নিশ্চিত করতে। হরিদ্বারে অবস্থানকালে সুযোগ পেলেই চলে যান মহাসাধক ভোলাগিরিকে বারবার প্রণাম করতে। বাবা কালীকমলিওয়ালার বুক অবধি দাড়ি এবং মাথায় এত কেশ যে দেখলেই দর্শকের মনে আধ্যাত্মিক ভাবের সৃষ্টি হয়। পাহাড়ি ঝড়-বৃষ্টির ঝাপটাকে আমল না দিয়ে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ একদা মুখোমুখি হয়েছিলেন বাবা কালীকমলিওয়ালার। তখন সবে অন্নছত্র থেকে বেরিয়ে কালীকমলিওয়ালা গুহায় ঢুকেছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেই প্রথমে থমকে দাঁড়ান এবং তারপরই একেবারে জড়িয়ে ধরেন। সেই প্রথম তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ; অথচ মনে হলো, বহু সন্ধানের পর দুই সাধক যেন তাঁদের হকের সিদ্ধিকে লাভ করলেন। গুহার অভ্যন্তরেই তৈরি একটি মাচার তলায় শতরঞ্জির ওপর বসে দুই জনই যেন সীমাশূন্য বাক্যালাপ করেছিলেন। ভাবের আদান-প্রদান শুরু হবার আগে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে অভ্যন্তরীণ ধুলো পরিষ্কার করেছিলেন গুহানিবাসী বাবা। একজন যখন কথা বলেন, অন্যজন তখন একাগ্রচিত্তে তার মর্মার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন। হালকা আলো, হালকা আঁধারে ভাবের

আদান-প্রদান দুই মহামানবের। বয়সের ব্যবধান অবশ্য অনেক। স্বামী বিবেকানন্দ তরতাজা তরুণ; অন্যদিকে কালীকমলিওয়ালা প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডি পেরিয়ে অবশ্যই বৃদ্ধ। নানারকম দৈহিক সমস্যায় আক্রান্ত। মাঝে মাঝে পাহাড়ি কৃষকরা এসে তাঁকে অবহিত করেন যে, প্রাকৃতিক ঝাপটায় মকাই ফসলের অবস্থা বিলকুল অকহতব্য। কমলিওয়ালা মুচকি হাসেন। যতই দুর্নাম করা হোক, শীতে কাঁপুনি, গ্রীষ্মে দাহ এবং বর্ষায় ভেসে যাই ভেসে যাই অবস্থা—এরা তো একে অপরকে টেক্কা দেবেই। একটা যেন আর একটার ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে। উপায়ন্তর নাস্তি। মুহুর্মুহু আক্ষেপ মানে নিজেকেই জীর্ণতর করা। ঘণ্টা কয়েক এই গুহাতে কাটিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বেরিয়ে এলেন। এখানে আসবার পর এদিক ওদিক কত ঘুরেছেন বুভুক্ষের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে লুঠ করতে। আদতে দেশের হালচাল এক-এক জায়গায় এক এক রকম। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি। কেউ উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন; আবার কিছু ধূর্ত তক্কে তক্কে থাকে সেই শ্রমের ফসলকে আপন ভোগে লাগাবার জন্য। তথাপি সব মিলিয়ে এই দেশ মহান। চাউর হওয়া ঘোরতর মিথ্যাকে মানুষই শনাক্ত করে থাকে। নরম সরম লোকও বিশেষ সন্ধিক্ষণে জড়ো হয় প্রত্যাঘাত শানাতে। শোষক ও অহমিকায় ডগমগ ইংরেজরা সর্বক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে হেয় করতে। তাদের সেই বদনাম রটাবার নাটুকে প্রয়াসের মূর্ত প্রতিবাদ হয়ে উঠেছিলেন স্বামীজী। বহুবিধ ভুল তথ্য ও অবজ্ঞার জঞ্জালকে চিনতে ও চেনাতে তিনি বিশ্বপরিক্রমাও সম্পন্ন করেছেন। তারপরও সর্বক্ষণ এই দেশকেই জানতে ও জানাতে তিনি জীবন লাগিয়েছেন। দুর্গম পাহাড়ি পরিক্রমার মাধ্যমে উপস্থিত হলেন হৃষীকেশে এবং পরিচিত হলেন বাবা কালীকমলিওয়ালা এবং তাঁর গঠনমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে। এর কিছুদিন বাদেই তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'তামাম ভারত ঘুরে এলাম। ডানদিকে- বাঁদিকে সব দেখেছি। ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা কিছু মানুষের উপদ্রব যেমন দেখলাম, তেমনি দেখলাম দেবতুল্য মানবপ্রেমীকেও। তাঁরা হামেশাই কিছু না কিছু করে চলেছেন সাধারণ মানুষের জন্যই। দরিদ্র কিংবা অথর্ব অথবা অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে যেন পাঁজাকোলা করে তারা নিরাপত্তা দিতে চান সময় ও পরিস্থিতির জোয়ার-ভাটাকে উপেক্ষা করে।

ইত্যাকার অনন্য মানব-মানবীর মধ্যে নির্ঘাত প্রণম্য ব্যক্তিত্ব হলেন হৃষীকেশের বাবা কালীকমলিওয়ালা। অপরের কল্যাণার্থে নিজেকে প্রায় দিকজ্ঞানশূন্য অবস্থায় চুপিসাড়ে টেনে আনেন। অন্যের দুঃখে বিচলিত তিনি হাত বাড়িয়ে দেন সাহায্য করতে। তাঁর তাবৎ তাবৎ গুণাবলীকে একত্রিত করলে হিন্দুধর্মেরই সারাংশ মেলে।

একজন সন্ন্যাসীর আবেদনব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের এইরূপ সংযোজন অবশ্যই বিরল। একটু সন্ধানী হলেই হরিদ্বার ও হৃষীকেশের একাধিক স্থানে বাবা কমলিওয়ালার ছবি আপনার দৃষ্টিতে ধরা দেবে। লালাজেঠা গায়ে বসে আছেন বা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তান্ত্রিক। দেখলেই মনে হবে, ইনি খুবই ব্যস্ত। এখনই হয়তো বেরিয়ে পড়বেন তীর্থযাত্রীদের সেবায়। অনুগামীরাও সকলে একপায়ে খাড়া কোমরে গামছা বেঁধে। আদতে জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন সংসারে। বাবা-মা, স্বজন-পরিজন, সর্বোপরি সুন্দরী অর্ধাঙ্গিনী। জন্ম ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩১। জন্মস্থান পঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার গ্রাম জামালপুরে। মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর সেই স্থানটিকে। কৃষিনির্ভর পরিবার। পারতপক্ষে সেই পরিবারের কেউ শহরমুখো হন না। সাংসারিক জীবনে জাতকের নাম বিসারা সিংহ। স্বাস্থ্যবান, তাঁর সৌন্দর্যে গোটা পরিবার আলোকিত। সম্পন্ন পাঞ্জাবি কিছু পরিবার। জমিজমা বিস্তর। পূজা-পার্বণে টাকা ঢালা হয় অঢেল। স্বাস্থ্যবান বালক বিসারা জ্ঞান হবার পর থেকেই উত্তরীয় গায়ে প্রায়সময় একাকী বসে বসে কী যেন ভাবে। আনমনা, আত্মভোলা হলেও দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে এবং সকলের খোঁজখবর নেয়। কারোর জন্য কিছু করতে পারলে আনন্দে আত্মহারা। চাষের জমিতে পাখি এসে বসলে খুশি হয়। তাদের দানা খাওয়ায়। তখন তাকে সেখান থেকে টলানো মুশকিল। সুযোগ পেলেই পাখি আটকাবার জাল কেটে দেয়। কখনও কখনও দেখা যায়, বিসারা কোনও ভিখিরির পেছন পেছন দৌড়চ্ছে তাঁকে এক মুঠো গম ভিক্ষে দেবে বলে। আবার যাত্রীঠাসা নৌকা নদী পার হতে দেখলে সে কেমন উদাস হয়ে যায়। বাড়িতে ফিরে চাতালের ওপর যেন সেই ছবিটাই দেখতে পাচ্ছে।

ঘোর বিষয়ী বাবা-মা সন্তানের এই মানসিকতা দেখে বিচলিত তো হবেনই। তাঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, তাঁদের সন্তান অমন ভাবুক প্রকৃতির হয়ে যাচ্ছে কেন দিন দিন? তাঁদের বিচারে সুরাহার পথ রয়েছে একটাই এবং তা হলো, ছেলেটার জীবনে একটি সুন্দরী মেয়েকে এনে স্থাপন করা। সামান্য খোঁজ চালাতেই তাঁরা সেই কন্যার সন্ধানও পেয়ে গেলেন। নাম রিচা। বয়স চোদ্দ। খুব ঘটা করে বিসারার সঙ্গে রিচার বিয়ে দেওয়া হলো। মোটা অঙ্কের কনে পণ পেলেন রিচার বাবা। বিয়ের সময় বিসারার বয়স সবে ষোলো। রোজগারের খোঁজে ময়দানে নামবার সময়ও হয়নি। তদুপরি বউয়ের সঙ্গে যে খুনসুটি করবে, সোহাগ জানাবে তাও মনে হয় না। অবশ্য মা-বাবার ধৈর্য অসীম। তাঁরা অপেক্ষা করেই চলেছেন। এভাবেই অতীত হয়ে গেল আরও একটি যুগ। একবারের জন্যও ঘটেনি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মিলন। রিচা খুব চেঁচামেচি করেন। বিসারা নির্বিকার।

১৮৬৩ সনের ৩ জুন, বিসারা গৃহত্যাগ করলেন। নিখাদ মহানিষ্ক্রমণ। আর একটি বারের জন্যও ঘরে ফিরে আসেননি। অহরহ শুনতে পাচ্ছিলেন কেবল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। দিশা অব্যর্থ। ভূগোল জানা না থাকলেও ঘুরতে থাকলেন ভারতের এই প্রান্ত থেকে সেই প্রান্ত। ঘুরতে ঘুরতে চুনার হয়ে ঢুকে পড়লেন বারাণসীতে। হিন্দুদের মহাতীর্থ। অনেকে আসেন পুণ্য অর্জন করতে। আবার অনেকে আসেন শিবের নিকট নাকে খত দিয়ে আর পাপ না করবার শপথ করতে। গঙ্গাতীরে সদা প্রাণচঞ্চল কাশীকে বড়োই ভালো লেগেছিল বিসরার। সেখানেই তিনি সাক্ষাৎ পেলেন স্বামী শঙ্করানন্দ

পরমংসদেবের। এই সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ যিনিই আসেন, তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গীতে আসে পরিবর্তন। দুর্বিনীতরাও লাভ করে ন্যায়বোধ ও ঈশ্বরপ্রেম। বিসরা সটান গিয়ে সন্ন্যাসী শঙ্করানন্দের পা জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁরই নির্দেশে গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস। গুরু তাকে বললেন, 'তোর মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র জাত্যভিমান না থাকে। মানুষ সকলেই সমান। এই পৃথিবীতে এসেছিস কেবল মানুষকে সেবা করবার জন্য। বিশেষত তীর্থে গিয়ে যাঁরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তাঁদের আহারের বন্দোবস্ত করাটাই হবে তোর জীবনের মুখ্য ব্রত।' বিসরার নতুন নাম হয় 'কালীকমলি'। যিনি তারপর সর্বক্ষণ তীর্থযাত্রীদের সেবা করতে উন্মুখ। এই কর্মেই তাঁর সার্বিক আনন্দঘন মগ্নতা। অপরকে তুষ্ট করবার পর কোনও ব্যক্তি যে অমন বিনয়ী হতে পারেন, কালেভদ্রেও দেখা যায় না। এমত উদ্দীপনা নিয়ে কমলিওয়ালা ঘুরতে থাকেন ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থস্থান। তীর্থে এসে কেউ বিপন্ন হয়ে পড়লে তাঁরই উদ্বেগ ও ব্যস্ততা হয়ে ওঠে সর্বাধিক। কল্যাণ প্রদানকারী মন্ত্রগুলি তাঁর একেবারে কণ্ঠস্থ। অনুগামীদের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। তাঁদের কাছ থেকে জনসেবামূলক কাজ আদায় করতে তিনি প্রকৃতই সফল। একে একে ঘুরলেন দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থানগুলি। প্রতিটি স্থান মহাতীর্থ এবং হিন্দুত্বের মহিমায় অতুলনীয়। পর্যায়ক্রমে ঘুরলেন, অবস্থানও করলেন কেদার, বদ্রী, কালীঘাট, গঙ্গার তীরবর্তী বহু তীর্থস্থান, মানসসরোবর। এ যেন স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হতে মাথা পেতে আশীর্বাদ গ্রহণ করা। কিছু তীর্থস্থানের অবস্থান দুর্গম। পথে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসা অলভ্য, খাদ্যাভাবও স্বাভাবিক। আদর-আপ্যায়ন লাভের সুযোগ নেই বললেই চলে। তবুও প্রকৃত সাধক যিনি, তিনি ওসবের পরোয়া করেন না।

বাবা কমলিওয়ালা সূচনাতেই যে শপথ নিয়েছিলেন, তার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য, আমি পথের দুর্গমতাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবো না; কিন্তু ক্ষুধায় কাতর তীর্থযাত্রীদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করবো সাধ্যানুসারে।

ইত্যাকার মহৎ কর্মে নিবিষ্ট চিত্ত সাধু কমলিওয়ালা প্রমাণ করলেন মানবসেবায় তিনি ক্রমে শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছেন। তাঁর শুদ্ধ সেবায় তীর্থযাত্রীদের ক্লান্তিও দূর হচ্ছে। ক্রমে সাধুমণ্ডলীও তাঁরই নেতৃত্ব মেনে নিলেন প্রতিটি সেবামূলক কর্মে। তবে অতশত সেবা তথা সাধনকার্যে গতি আনতে হলে প্রয়োজন বিপুল অর্থ ও বিত্তের। প্রথমদিকে কলমিওয়ালা সাহায্যের জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতেন দুর্গমপথের হরেক বাঁকমুখে। লোক চলাচল বাড়তে থাকে যেন ঈশ্বরেরই কৃপায়। ভিক্ষার্থী এই সন্ন্যাসীর পাত্রে তাঁরা অল্পস্বল্প টাকা দিতেও শুরু করলেন। তবে খুব বেশিদিন বাবাকে এভাবে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। উত্তরপ্রদেশের জনাকয়েক ধনবান তীর্থযাত্রী এসে গেলেন টাকার থলি পিঠে ঝুলিয়ে। তাঁরা বুঝেছিলেন, এই সাধু আসলে ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানব। কাজেই এই ব্যক্তির আদর্শে প্রাণিত হয়ে অর্থ সাহায্য করে যেতে পারলে নিজ নিজ পাপের বোঝা লঘু হতে থাকবে, পুণ্যের ছোঁয়া লাগবে জীবনে। অচিরে অর্থাভাব দূর হলো। টাকার ভাণ্ডার উপচে পড়ল। কালীকমলিওয়ালা তখন তাঁর সহজাত নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতা নিয়ে মহাতীর্থ হৃষীকেশে পাকাপাকিভাবে যে অন্নসত্র খুলে বসলেন, সারা ভারতে তা অতুলনীয়। রান্নার লোক, জোগানদার, অন্য সকল কাজের লোক সকলেই যে কোত্থেকে চলে এল, তা একমাত্র ঈশ্বরেরই অনুগ্রহ। হিমেল তীর্থপথে সে এক নবজাগরণ। সকালে, দুপুরে তো বটেই, সন্ধ্যা ও রাতেও তীর্থযাত্রীরা সেখানে আহার পান। ঝড়-বৃষ্টি হানা দিলে সাময়িক, নিরাপদ আশ্রয়ও মেলে। এসবের জন্য কোনও টাকাপয়সা দিতে হয় না। কেউ যদি কিছু দান করেন, সেটা সেবার কাজেই সহায়ক হবে। বাবা কালীকমলিওয়ালা যেন স্বয়ং শিব। যেদিন উপস্থিত থাকেন, বহু হ্যাপা তিনি একাই সামাল দেন। কাজের চাপ কম থাকলে মন্দিরের পিছনে নির্দিষ্ট আসনে ধ্যানে বসে যান। তাঁর জীবনযাত্রায় কোনও জটিলতা নেই। নেই কামনা বাসনা। অন্নসত্র বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। তারপর হৃষীকেশে আরও একটি মহৎ কর্ম করলেন বাবা। এটাও হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্যই। কলকাতার বড়বাজারের ধনকুবের ব্যবসায়ী দুলপাবন ঝুনঝুনওয়ালা সপরিবারে তীর্থ করতে এসেছিলেন হৃষীকেশে। তখন সেখানে ঘনঘোর মেঘ থেকে অবিরাম অকাল বর্ষণ। ঝুনঝুনওয়ালা সপরিবারে তখন আশ্রয় ও আহার পান বাবা কমলিওয়ালার অন্নছত্রে। যাবার আগে বাবার চরণে রেখে যান বিশাল ব্যাগভর্তি টাকা। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আরও টাকা পাঠান। আর সেই বিপুল অর্থেই বাবা কালীকমলিওয়ালা আরও একটি বৃহৎ কালজয়ী নির্মাণকার্য সম্পন্ন করলেন তীর্থযাত্রীদেরই সুবিধার জন্য। নির্মিত হলো লছমনঝোলার সেই বিশ্বখ্যাত সেতু। ওই সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যে সকল অনন্য ব্যক্তি, তাঁদের অন্যতম হলেন হরিদ্বারের দেবপ্রতিম সাধক ভোলাগিরি মহারাজ। ভোলাগিরি বারবার বলতেন, 'কালীকমলি স্বয়ং ঈশ্বরের দূত। মানুষের সেবায় এরকম নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসী বিশ্বইতিহাসে অতি বিরল।'

সন্ন্যাস গ্রহণের পর জীবনের অবশিষ্টাংশ কালীকমলিওয়ালা আরও বহুবিধ জনকল্যানমূলক কর্মসাধন করেছেন। প্রতিটি কর্ম সুসম্পন্ন। কোথাও কোনও বিরোধ, কোনও আস্ফালন, কোনও নিন্দা বাতাসেও ভাসেনি। কালের প্রভাবে ভেস্তে যেতে পারে, এরকম কোনও কাজ তিনি করেননি। তাঁর ছিল অমেয় বিশ্বজয়ী আধ্যাত্মিক শক্তি। সেই শক্তিকে তিনি কদাপি মারণ-উচাটন ইত্যাদি হিংস্র অপকর্মে ব্যবহার করেননি। একজন প্রভাবশালী রাজপুরুষের সঙ্গে তাঁর যেমন বিনম্র আচরণ ছিল, একজন হতদরিদ্রের সঙ্গেও তা ছিল একেবারে অপরিবর্তিত।

১৮৯০ সনে বাবা বহুকাল বাদে পাহাড় থেকে নেমে আসেন সমতলে। হয়তো তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মহানিষ্ক্রমণের পথে পা রেখেছেন এবার। তথাপি তিনি শুধুমাত্র দু'পায়ের ওপর নির্ভর করে হেঁটে হেঁটে চক্রকারে ঘুরলেন এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে।

পরিশেষে সেই কাশী। কাশীর বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণে সেই যে লুটিয়ে পড়লেন আর উঠে দাঁড়ালেন না। দিনটি ১৮৯৯ সালের ১১ ডিসেম্বর। □

প্রত্যন্ত ত্রিপুরার কুল্লুক পূজা

অসিত দাস

প্রত্যন্ত ত্রিপুরায় চড়ক পুজার আগের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির আগের রাতে কুল্লুক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ আবার কেমন পূজা, হিন্দুদের বারো মাসের তেরো পার্বণের শেষ পার্বণ হলো চড়ক পূজা। ছোটোবেলায় আর যুবক বয়সে এই পূজার জন্য আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম। সে এক দিন ছিল! সবকিছু কেমন যেন হারিয়ে গেল। সংক্রান্তির ১৫ দিন আগে থাকতেই নানান পালাগান হতো, হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বালিয়ে নানা রঙিন পোশাক পরে, লব-কুশের গল্প, রাজা-রানির উপাখ্যান, লক্ষ্মী-শনিদেবের উপাখ্যান, মহিরাবণের উপাখ্যান, রাবণ বধ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ইত্যাদি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুরে ঘুরে পালা করতাম। ঢাকের তালে নেচে নেচে তির ধনুক আর তরবারি নিয়ে যুদ্ধের অভিনয়। এখন দূরদর্শন ও অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক মাধ্যম সবকিছু যেন গিলে খেল। ওখান থেকে যে চাঁদা সংগ্রহ হতো, তাই দিয়ে চড়ক পূজা হতো। গ্রামের মানুষ অতি সাধারণভাবেই জীবনযাপন করত, কিন্তু পূজার উৎসব অনুষ্ঠানে আনন্দের খামতি ছিল না। ছোটো বড়ো সকলে হাত লাগিয়ে পূজার সমস্ত কাজ আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করতো। শহরের মতো নয় ডেকোরেটারদের হাতে দিয়ে নিজেরা কেবল দর্শক হয়ে থাকা।

কুল্লুক হলো শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি একটা আলম্ব যন্ত্রবিশেষ যাকে অবলম্বন করে চড়ক ঘুরতে থাকে, আসলে প্রকারান্তরে শিব ঠাকুরকে পূজা করা হয়। কুল্লুক পূজার দিন সকালবেলা কর্দমাক্ত মাঠে কাবাডি খেলাটা একটা রীতি ছিল। কাবাডি খেলার পর সকলে মিলে জঙ্গলে গিয়ে শক্ত খাইল্লাই বাঁশ কেটে আনত। এক একটা দিকে প্রায় বারোটা করে বাঁশ আড়াআড়ি করে বাঁধা হতো, তারপর চারিদিকে বাঁশের সরু পাতি দিয়ে গোল করে বেঁধে চারিদিকে রঙিন পতাকা দেওয়া হতো। দড়ি আর গামছা দিয়ে বসে থাকা শিবঠাকুরের মূর্তি (পোত্তল) উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো।

সংক্রান্তির আগের দিন রাত্রিতে শুরু হতো কুল্লুক পূজা। ঢাকঢোল কাঁসরের শব্দের চারিদিকে মুখরিত হয়ে উঠতো, এই পূজার প্রসাদ হলো ফল-সিন্নি, খিচুড়িও দেওয়া হয় আর বড়োদের জন্য থাকে বিশেষ খাবার সুখা প্রসাদ-গঞ্জিকা। অন্য সময় এটা বড়োই দোষের। কিন্তু কুল্লুক পূজায় বড়োরা অনেকে কলকেতে সুখের টান দিয়ে থাকেন। একবার তো যোগেন্দ্র জ্যাঠা বেশি টান দিয়ে কী বিপত্তিই না ঘটালেন, বাড়ির কাছে গিয়ে আমাকে বলেন, আরে এককানা ঘাঁড়ায় উডাই দিবিনি (নোয়াখালি ভাষা অর্থাৎ আমাকে একটু বাড়ির রাস্তায় উঠিয়ে দেবে কিনা), আরেকবার সুখেন কাকু রাস্তার মাঝে উপুড় হয়ে শুয়ে ধুলোয় সাঁতার কাটতে থাকেন— আর বলে, কত জল আই, কেননে যাইতাম। এরকম উলটপালট কাণ্ড কারখানা দেখে গ্রমের সকলেই মজা করত।

চৈত্র সংক্রান্তির সকালবেলা গ্রামের সব বাড়ির উঠোন গোবর দিয়ে নিকানো হতো, ঘরের দরজা ফুলের মালা আর ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হতো, গোরু-বাছুরকে স্নান করিয়ে গলায় ফুলের মালা দিয়ে পূজা করা হতো। দুপুর থেকে কুল্লুকের চারিদিকে বাঁশ বেঁধে তাতে চড়ক আকারে পরিণত করতেন গ্রামের বয়স্ক মানুষজন। চড়ক দণ্ড হতো শাল গাছের, ঘি-ডিম ভেঙে কুল্লুকের ভেতরে আর চড়ক দণ্ডের মাথায় লাগানো হতো যাতে ঘুরতে সুবিধা হয়। ঢাকঢোল কাঁসির ঝংকারে চড়ক ঘুরত বনবন করে, আমরা কয়েকজন আবার অতি উৎসাহিত হয়ে দড়ি বেয়ে কিছুটা উপরে উঠে যেতাম। ঘুরন্ত অবস্থায় কোনোরকম একটু নীচে নেমে লাফিয়ে নামতে হতো, প্রায় ২০ ফুট দূরে গিয়ে লাট্টুর মতো ছিটকে পড়তাম। হাত পা ছড়ে যেত অনেকের, তাতে কারোর কোনো ভ্রূক্ষেপ হতো না। চড়ক শেষে পোত্তল মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরা, শিবঠাকুর স্থান হতো ঠাকুরঘরের এক কোণায়। গ্রামে এখন চড়ক কেমন হয় জানি না, এআই টেকনোলজির যুগ আর পঠনপাঠনের যেরকম চাপ তাতে এরকম দস্যিপনা করার মতো ছেলেপুলে গ্রামে আছে কিনা শিবঠাকুরই বলতে পারেন। □

বিশ্বের সামনে উদাহরণ সৃষ্টিকারী সমরস ও সংগঠিত ভারত নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সংকল্পবদ্ধ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা কর্ণাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালুরু স্থিত চেন্নহেল্লি নগরের জনসেবা বিদ্যামন্দির পরিসরে গত ২১,২২,২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিবসীয় বৈঠকে সারা দেশ থেকে ১৪৮২ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় অধিকারী, কার্যকারী সদস্য, ক্ষেত্র ও প্রান্ত কার্যকরী সদস্য, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বিভাগ প্রচারকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ধর্মজাগরণ সমন্বয়, সামাজিক সমরসতা, পর্যাবরণ, কুটুম্ব প্রবোধন, গ্রাম বিকাশ, গোসেবা— ছটি গতিবিধির প্রতিনিধি, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বিদ্যা ভারতী, বিজ্ঞান ভারতী, সংস্কৃত ভারতী, ভারতীয় শিক্ষা উত্থান ন্যাস, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, কিষাণ সঙ্ঘ, সংস্কার ভারতী, সংস্কৃতভারতী, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, সহকার ভারতী, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, ক্রীড়া ভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরোগ্য ভারতী, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, মহিলা সমন্বয়, প্রজ্ঞা প্রবাহ, ভারতী জনতা পর্টি প্রভৃতি সংগঠনের অখিল ভারতীয় স্তরের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে জানান, সারা দেশে সঙ্ঘ কাজের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৪-এর তুলনায় ১০ হাজার শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মোট ৫১,৫৭০ স্থানে ৮৩,১২৯ নিত্য শাখা; ৩২,১৪৭ সাপ্তাহিক মিলন এবং ১২,০৯১ মাসিক মণ্ডলী চলছে। সারা দেশে আয়োজিত প্রারম্ভিক বর্গে ২,২২,৯৬২ জন স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছে।

এই বছর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, যোগ্য প্রশাসক, অনবদ্য রাজনীতিবিদ তথা মহা পরাক্রমশালী কর্ণাটক রাজ্যের উল্লালের মহারানি আবাক্কার জন্মের ৫০০ বছর পূর্তি বর্ষ রূপে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বিশ্বের অজেয় সেনা বলে পরিচিত পর্তুগিজদের নিজ রাজত্বকালে বার বার পরাজিত করে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। অনন্য বীরত্বের কারণে ইতিহাসে তিনি 'অভয়ারানী' নামে পরিচিত। তিনি তাঁর শাসনে মন্দির ও তীর্থ সংস্কারের পাশাপাশি লোক সংস্কৃতির উন্নতিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

এবছর বিজয়াদশমীতে সঙ্ঘ শতবর্ষ পূর্ণ করবে। আগামী বছর সঙ্ঘকাজের প্রসার, পূর্ণ ও দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে স্বয়ংসেবক-কার্যকর্তারা তৎপর হবেন। শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নয়। আত্মচিন্তন, সঙ্ঘকাজ বৃদ্ধির জন্য সমাজ সমর্থনের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে নিজেদের সমর্পিত করতে হবে। শতবর্ষে আরও ব্যাপকভাবে সতর্ক থেকে গুণমানসম্মত কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনুমোদনক্রমে প্রতিনিধি সভায় দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে—

প্রস্তাব-১

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের পাশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়োনোর আহ্বান

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বাংলাদেশে হিন্দু-সহ অন্যান্য

ফঃ ৫

সংখ্যালঘুদের উপর ইসলামিক উগ্রবাদীদের দ্বারা অনবরত চলতে থাকা সুপরিকল্পিত হিংসা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এটি সুস্পষ্ট মানবাধিকার হননের গম্ভীর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সরকার পরিবর্তনের সময় মঠ-মন্দির, দুর্গাপূজা প্যান্ডেল ও শিক্ষাকেন্দ্রে আক্রমণ, মূর্তি অপবিত্র করা, নৃশংস হত্যা, সম্পত্তি লুঠ, মহিলা অপহরণ ও অত্যাচার, ধর্মান্তরণের মতো অনেক ঘটনা অনবরত সামনে আসছে। এইসব ঘটনাকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বলে এর সাম্প্রদায়িক দিককে অস্বীকার করার অর্ধ সত্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া, কেননা বেশিরভাগ অত্যাচারিত মানুষই হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

বাংলাদেশে হিন্দু সমাজ বিশেষ করে অনুসূচিত জাতি ও জনজাতি সমাজের উপর ইসলামিক উগ্রবাদীদের দ্বারা অত্যাচার কোনো নতুন কথা নয়। বাংলাদেশে ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকা হিন্দু জনসংখ্যা (১৯৫১-তে ২২ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৭.৯৫ শতাংশ) বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তাদের সামনে এখন অস্তিত্ব সংকটের সমস্যা। বিশেষ করে গত বছরের হিংসা ও বিদ্বেষ যেভাবে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে, তা খুব চিন্তার বিষয়। তার সঙ্গে বাংলাদেশে অনবরত ভারত-বিরোধী বক্তব্য দুই দেশের সম্পর্কে প্রচণ্ড ক্ষতি করে চলেছে।

কিছু আন্তর্জাতিক শক্তি জেনেবুঝে ভারতের প্রতিবেশী এলাকায় অবিশ্বাস ও সংঘর্ষের পরিবেশ নির্মাণ করে এক দেশকে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে অরাজকতা ছড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে। প্রতিনিধি সভা চিন্তাশীল গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের অনুরোধ করছে যে, তারা ভারত-বিরোধী পরিবেশ, পাকিস্তান ও 'ডিপ স্টেট'-এর সক্রিয়তার উপর নজর রাখুন এবং তা প্রকাশ করুন। প্রতিনিধি সভা এই তথ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রের একটি সমান সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে, যার দরুন এক জায়গায় হওয়া কোনো আন্দোলন সমগ্র এলাকাতেই তার প্রভাব ফেলে। প্রতিনিধি সভা মনে করে, সমস্ত জাগ্রত মানুষ ভারত ও প্রতিবেশী দেশের এই সমান ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করার বিষয়ে চেষ্টা করুন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ এই অত্যাচারের শান্তিপূর্ণ, সংগঠিত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাহসের সঙ্গে বিরোধিতা করছেন। প্রশংসনীয় বিষয় হলো, ভারত ও সারা বিশ্বের হিন্দু সমাজ একে নৈতিক ও ভাবনাত্মক সমর্থন জানিয়েছে। ভারত-সহ বিশ্বের বহু হিন্দু সংগঠন এই হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং বাংলাদেশের হিন্দুদের সুরক্ষার দাবি তুলেছে। এর সঙ্গে সারা বিশ্বের অনেক নেতাও এই বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভারত সরকার বাংলাদেশের হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নিজের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। তারা এই বিষয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চেও উঠিয়েছে। প্রতিনিধি সভা ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করছে, তারা যেন বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের সুরক্ষা, গরিমা ও স্বাভাবিক অবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য সেখানকার সরকারের সঙ্গে নিয়মিত বার্তলাপ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম চেষ্টা চালু রাখে।

প্রতিনিধি সভার মনে করে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের উচিত, বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতি অমানবিক আচরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং এই সহিংসতা বন্ধ করতে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। প্রতিনিধি সভা হিন্দু সমাজের সঙ্গে অন্যান্য দেশের নেতাদের ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে যে, বাংলাদেশি হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সমাজের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তুলতে।

প্রস্তাব-২

সঙ্ঘ শতাব্দী উপলক্ষ্যে সংকল্প

বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সমরস ও সংগঠিত হিন্দু সমাজের নির্মাণ

অনন্তকাল ধরেই হিন্দু সমাজ এক সুদীর্ঘ ও অবিস্মরণীয় যাত্রায় সাধনারত থেকেছে, যার উদ্দেশ্য মনুষ্য একতা ও বিশ্ব কল্যাণ। তেজদীপ্ত মাতৃশক্তির সঙ্গে সন্ত, ধর্মাচার্য ও মহাপুরুষদের আশীর্বাদ ও কর্তব্যের কারণে আমাদের রাষ্ট্র বিভিন্ন বাধা বিপত্তির পরেও নিরন্তর অগ্রসর হয়ে চলেছে।

কালের প্রবাহে রাষ্ট্রজীবনে আসা বহু দোষ দূরীভূত করে এক সংগঠিত, চরিত্রসম্পন্ন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র রূপে ভারতকে পরম বৈভবে নিয়ে যেতে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ শুরু করেন। সঙ্ঘকাজের বীজ রোপণ করে ডাক্তারজী দৈনিক শাখা রূপে ব্যক্তি নির্মাণের যে অভূতপূর্ব কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা ভারতের সনাতন পরম্পরা ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনির্মাণের নিঃস্বার্থ সাধনা। ডাক্তারজীর জীবনকালেই এই কাজ একটি রাষ্ট্রব্যাপী একটি স্বরূপে বিকশিত হয়। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় শ্রীগুরুজীর (মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর) দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতীয় জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে শাশ্বত চিন্তাভাবনার প্রকাশে সময়োপযোগী যুগানুকূল সংগঠনের নির্মাণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।

শতবর্ষের এই যাত্রায় সঙ্ঘ নিত্য শাখার দ্বারা অর্জিত সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের অটুট বিশ্বাস ও ভালোবাসা পেয়েছে। এই সময়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা ভালোবাসা ও আত্মীয়তার শক্তিতে মান-অপমান ও রাগ-দ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। সঙ্ঘকার্যের শতাব্দী কালে আমাদের কর্তব্য হলো, পূজনীয় সাধুসন্ত তথা সজ্জন শক্তি যাঁদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা সব রকম পরিস্থিতিতে আমাদের সহায়ক হয়েছে, জীবন সমর্পণকারী নিঃস্বার্থ কার্যকর্তা এবং মৌন সাধনায় রত স্বয়ংসেবক পরিবারগুলিকে স্মরণ করা।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ পরম্পরার অনুকূল সৌহার্দ্যপূর্ণ বিশ্ব নির্মাণ করার জন্য ভারতের কাছে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান রয়েছে। আমাদের চিন্তাভাবনা বিভেদকারী ও আত্মঘাতী প্রবৃত্তি থেকে মনুষ্য জাতিকে সুরক্ষিত রেখে বিশ্ব চরাচরে একতার ভাবনা ও শান্তি সুনিশ্চিত করে।

সঙ্ঘ মনে করে ধর্মের অধিষ্ঠানের উপর আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ সংগঠিত সামূহিক জীবনের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজ তার বৈশ্বিক দায়িত্ব প্রভাবী রূপে পালন করতে পারবে। তাই আমাদের কর্তব্য সব রকম ভেদাভেদকে অগ্রাহ্যকারী সমরসতাযুক্ত আচরণ, পরিবেশের উপযোগী জীবনশৈলীর উপর ভিত্তি করে মূল্যবোধযুক্ত পরিবার, 'স্ব'বোধের সঙ্গে ওতপ্রোত এবং নাগরিক কর্তব্যের প্রতি দায়বদ্ধ সমাজের চিত্র নির্মাণ করার জন্য আমরা সকলে সংকল্প করি। আমরা এর ভিত্তিতে সমাজের সমস্ত সমস্যার সমাধান, বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়ে জাগতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ সমর্থশালী রাষ্ট্রজীবন নির্মাণ করতে পারব।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সজ্জনশক্তির নেতৃত্বে সমগ্র সমাজকে সংগঠিত করে বিশ্বের সামনে সমরসসম্পন্ন এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ। □

এই সংশোধনী কেবল আইনি কাঠামোই শক্তিশালী করবে না, বরং ওয়াকফের মাধ্যমে সমাজের দুর্বল অংশের কল্যাণও নিশ্চিত করবে।

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ : দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্মান

সংস্কার ও ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের ভারসাম্য

রঙিন হালদার।। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪, ভারতের ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রভাব নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ এটিকে ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখলেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বিলটির মূল উদ্দেশ্য হলো স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, স্বেচ্ছাচারী দাবি প্রতিরোধ এবং ওয়াকফ সম্পত্তির সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ওয়াকফ সম্পত্তি ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয়, দাতব্য ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে দান, যা সম্প্রদায়ের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে, অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব, আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা এবং ওয়াকফ জমির অপব্যবহারের মতো সমস্যাগুলো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। ২০২৪ সালের সংশোধনী এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতেই আনা হয় যাতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোনো প্রভাব না ফেলে।

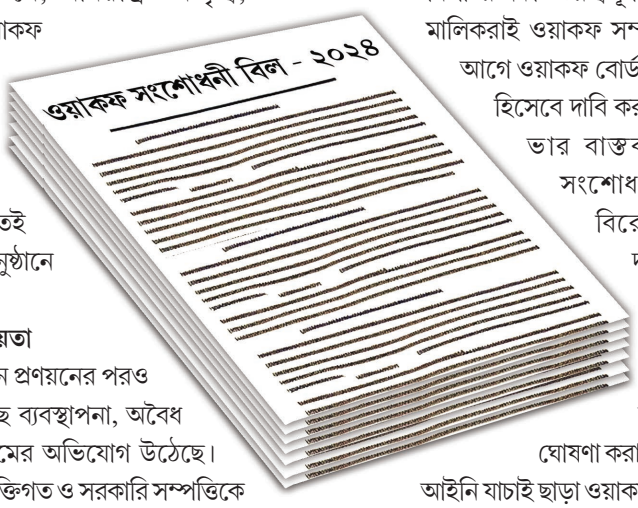

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন প্রণয়নের পরও অসংখ্য ঘটনায় সম্পত্তির অস্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা, অবৈধ জমি দখল এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ওয়াকফ বোর্ড কখনো কখনো ব্যক্তিগত ও সরকারি সম্পত্তিকে ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণা করে দেয়, যার ফলে মালিকদের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ড সারা ভারতে ৮.৭ লক্ষ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, যা ৯.৪ লক্ষ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এবং এর মোট মূল্য ১.২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া ট্রাইব্যুনালে ওয়াকফ সংক্রান্ত ৪০ হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যার অনেকগুলোতে ব্যক্তিগত নাগরিকরা তাদের জমির মালিকানা নিয়ে ওয়াকফ বোর্ডের দাবির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। সংশোধনীটি ওয়াকফ সম্পত্তির সঠিক ডকুমেন্টেশন, আর্থিক লেন-দেনে স্বচ্ছতা এবং জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধের ন্যায্য নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে চায়।

ন্যায্য মালিকানা নিশ্চিতকরণ; স্বেচ্ছচারী জমি দাবি রোধ

বিলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, শুধুমাত্র আইনসম্মত মালিকরাই ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করতে পারবেন। আগে ওয়াকফ বোর্ড যে কোনো সম্পত্তিকে ওয়াকফ হিসেবে দাবি করার ক্ষমতা রাখত এবং প্রমাণের ভার বাস্তব মালিকের উপর বর্তাত। সংশোধনীতে এই অসাম্য দূর করে বিরোধপূর্ণ মালিকানা নির্ধারণের দায়িত্ব ওয়াকফ বোর্ডের বদলে কালেক্টরের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিলটিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সরকারি জমিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা যাবে না, যা সরকারি সম্পত্তিকে আইনি যাচাই ছাড়া ওয়াকফ হিসেবে নথিভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এই পরিবর্তনটি উচ্চমূল্যের সরকারি সম্পত্তি, যেমন কোর্ট কমপ্লেক্স বা গোটা গ্রামের উপর ওয়াকফ সম্পত্তি দাবির মতো ঘটনাগুলো প্রতিরোধ করবে, যা বিভিন্ন রাজ্যে আইনি বিবাদের সৃষ্টি করেছে।

ডিজিটালাইজেশন : ওয়াকফ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ

সংশোধনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হলো ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি। সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে এই সংশোধনী দুর্নীতি হ্রাস, অননুমোদিত বিক্রি রোধ এবং আর্থিক তদারকি উন্নত করা। পুরাতন অসম্পূর্ণ ওয়াকফ সম্পত্তির রেকর্ড ছিল, যার মালিকানা, আর্থিক লেন-দেন এবং জমি দখলের তথ্য উদ্ধার কঠিন হয়ে পড়েছিল। নতুন ব্যবস্থায় সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির ইলেকট্রনিক নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে এবং কার্যকর অডিটের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ওয়াকফ বোর্ড : প্রতিনিধিত্ব সম্প্রসারণ

ওয়াকফ বোর্ডের গঠন কাঠামো প্রায়শই অন্তর্ভুক্তির অভাবের জন্য সমালোচিত হয়েছে। নতুন বিলটি এই সমস্যা সমাধানে মুসলমান নারী এবং অমুসলমান প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করেছে। এটি বিস্তৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং পক্ষপাত ও অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির ঝুঁকি কমাবে। ওয়াকফ প্রশাসনে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে, সংশোধনীটি দায়বদ্ধতা শক্তিশালী করতে এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করতে চায়, যাতে সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।

আর্থিক তদারকি শক্তিশালীকরণ : দুর্নীতি প্রতিরোধ

ওয়কফ বোর্ডসমূহে আর্থিক অনিয়ম দীর্ঘদিন ধরে একটি সমস্যা হিসেবে রয়েছে, যেখানে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে নির্ধারিত তহবিল সঠিক অডিটিং ব্যবস্থার অভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়। সংশোধনীতে নিয়মিত অডিট বাধ্যতামূলক করা, আর্থিক ব্যবস্থার কারণে অন্যত্র চলে যায়। সংশোধনীতে নিয়মিত অডিট আর্থিক রেকর্ড জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা এবং আর্থিক অনিয়মের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। স্বচ্ছতা প্রয়োগের মাধ্যমে, বিলটি নিশ্চিত করতে চায় যে ওয়াকফ তহবিল তার নির্ধারিত উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে, যা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষামূলক প্রকল্প ও সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগের জন্য সহযোগী হবে।

আইনি ব্যবস্থা বৃদ্ধি : হাইকোর্টে আবেদনের সুযোগ

পূর্ববর্তী আইনে, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হতো, যা আক্রান্ত পক্ষগুলোর আইনি ক্ষমতা হ্রাস করে। নতুন বিলে ব্যক্তিদের ট্রাইব্যুনালের রায় হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করবে। এই বিধানটি ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের রায়ে সম্ভাব্য পক্ষপাত দূর করবে এবং একটি ন্যায্য আপিল প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে।

অবৈধ দখল থেকে ওয়াকফ সম্পত্তি সুরক্ষা

ওয়াকফ জমিতে অবৈধ দখল একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, যেখানে অসংখ্য সম্পত্তি অবৈধভাবে দখলীকৃত বা অননুমোদিতভাবে বিক্রি হয়েছে। সংশোধনীতে ওয়াকফ বোর্ডকে অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের আদেশ দানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলোকে সুরক্ষিত করা হবে, যাতে সেগুলো তাদের মূল ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতে পারে।

উপসংহার : স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার দিকে অগ্রসর

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪, ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও দক্ষতা আনতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করে সম্পত্তির সুরক্ষা, আর্থিক দায়বদ্ধতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করে। ডিজিটালাইজেশন, নারী ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব এবং হাইকোর্টে আপিলের সুযোগের মতো সংস্কারগুলো ওয়াকফ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও ন্যায়সংগত করে তুলবে। এই সংশোধনী কেবল আইনি কাঠামোই শক্তিশালী করবে না, বরং ওয়াকফের মাধ্যমে সমাজের দুর্বল অংশের কল্যাণও নিশ্চিত করবে। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

পশ্চিমবঙ্গ কি দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে চলেছে?

বিপ্লব বিকাশ

ভারতের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সংকট শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং সামাজিক ও ধর্মীয় স্তরেও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়িতে সংঘটিত জেহাদি আক্রমণ আবারও এই সত্যকে প্রকাশ্যে এনেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সমাজকে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রমাগত দুর্বল থেকে দুর্বলতর করা হচ্ছে। মালদায় হিন্দুদের দোকান, বাড়িঘর চিহ্নিত করে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়েছে। তাদের ব্যবসা থেকে উৎখাত করার জন্য নানা প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে এই আক্রমণের সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক হলো, রাজ্য সরকার তাদের তোষণ নীতি বাস্তবায়নে ব্যস্ত রয়েছে। স্বাধীনতার আগে ও পরে এই রাজ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই আক্রমণের একটি নতুন, ভয়ংকর ও সুসংগঠিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এটি শুধুমাত্র জেহাদি গোষ্ঠীর অপকর্ম নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনা, যা ধীরে ধীরে এই রাজ্যকে আরেকটি কাশ্মীরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মালদার মোথাবাড়িতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা একক ঘটনা নয়, বরং এটি সেই অসংখ্য ঘটনার একটি অংশ, যা বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলেছে। মানুষ এখনো আরজি কর, দুর্গাপূজার বিসর্জনের ওপর পাথরবৃষ্টি, বেলডাঙ্গার কার্তিক পূজায় আক্রমণের ঘটনা ভুলতে না ভুলতেই আবার মালদার মোথাবাড়ি! এটি কি শুধুমাত্র এক আকস্মিক ঘটনা যে, যখনই হিন্দু উৎসব আসে, তখনই আক্রমণ শুরু হয়? এটি কি কেবলমাত্র একটি কাকতালীয় ঘটনা যে দুর্গা পূজার বিসর্জনে বারবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়? এটি কি শুধুই একটি সমাপতন যে রামনবমীর শোভাযাত্রায় বার বার পাথরবৃষ্টি করা হয়? এবং এই সমস্ত ঘটনাকে উপেক্ষা করে অমর্ত্য সেনের মতো ব্যক্তিত্বরা জেহাদি আক্রমণের বিষয়ে নীরব থেকে শুধুমাত্র মন্তব্য করেন যে বঙ্গভূমির সঙ্গে শ্রীরামের কোনো সম্পর্ক নেই।

না, এগুলি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনসংখ্যার গঠনকে বদলে ফেলা হচ্ছে। হিন্দুদের হয়তো পলায়নের জন্য বাধ্য করা হচ্ছে, নয়তো ভয় ও নির্যাতনের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে। জমি, বাগান, পুকুর এখন সব কাদের হাতে? একবার খোঁজখবর নিয়ে দেখুন। মালিকের নাম যাই হোক দখল অন্য কেউ নিয়ে নিয়েছে।

এই গোটা প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি সন্দেহজনক ও আপত্তিজনক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার স্পষ্টভাবে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে 'দুধেল গোরু' আখ্যা দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের সর্বাত্মক রক্ষা করে চলেছে। যদি সরকারি নীতির দিকে তাকানো হয়, তবে দেখা যাবে যে মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ বাজেট কেন্দ্র সরকারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশি। এই বাজেট শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবতা হলো এই অর্থের বড়ো অংশ সেইসব সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলোর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, যারা সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রেশন কার্ড, আধার কার্ড, এমনকী ভোটার আইডি পর্যন্ত জোগাড় করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা রাজনৈতিক সমীকরণকে প্রভাবিত করতে পারে এবং জেলাগুলির জনবিন্যাস পাল্টে নির্বাচনে একটি স্থায়ী ভোটব্যাংক তৈরি করতে পারে।

মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলোর পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে, সেখানে হিন্দুরা এখন নিজেদের এলাকাতেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এটি হুবহু সেই পরিস্থিতির মতো, যা একসময় কাশ্মীরে দেখা গিয়েছিল। ১৯৮৯-৯০ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাদেরই বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নারীদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চালানো হয়েছিল এবং তারা নিজেদের দেশেই শরণার্থী হয়ে রাস্তায় বা ক্যাম্পে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে এটিও সেই একই পথে এগোচ্ছে বলে মনে হয়। গ্রামেগঞ্জে হিন্দুদের জমি, বাড়ি দখল নেওয়ার খবর তো পত্রিকায় শোকসংবাদের মতো নিয়মিত খবর হয়ে গেছে। একটু সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে খবর নিলেই মাথায় হাত পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ আজ এক কঠিন সংকটের মুখোমুখি। এটি কেবল রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটি অস্তিত্বের লড়াই। আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও অধিকার রক্ষার লড়াই। কতদিন আমরা সহ্য করবো? কতদিন চুপ করে দেখবো? সময় এসেছে, যুবসমাজ, প্রবীণ, ছাত্র, শ্রমিক— রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে একত্রিত হই, নিজেদের জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রুখে দাঁড়াবো। যদি আজ আমরা না জাগি, না লড়াই করি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন এক সময়ের মুখোমুখি হবে, যেখানে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। কাশ্মীরে কাশ্মীরি হিন্দুদের অনেক বড়ো-বড়ো কেশরের বাগান, বাগান-বাড়ি, মহল আছে কিন্তু সেটা আর তাদের দখলে নেই। তারা চাইলেও দখল নিতে পারছে না। ভাবছেন সরকার কি করছে, তাই না? মনে রাখবেন আপনার মা মাটি আর মানুষের রক্ষা আপনাকেই করতে হবে কোনো দল আপনার রক্ষা করতে পারবে না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

তাই বঙ্গের প্রতিটি হিন্দুকে এখন দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে— ভয় ত্যাগ করে, দ্বিধাহীন হয়ে ঝেড়ে ফেলে একতার শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। আমরা যদি একসঙ্গে থাকি, তাহলে কোনো শক্তিই আমাদের মাটিতে আমাদের অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে পারবে না। এখনই সময়, নিজের অধিকার, আত্মপরিচয় ও ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার! একবার ভাবুন, পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে দেখতে পারবেন তো? □

দেশভক্ত কেশব

আমাদের দেশ তখন ইংরেজদের হাতে আমরা পরাধীন। সারা দেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। আন্দোলনে ইংরেজদের সবচেয়ে বড়ো ভয়ের কারণ হয়ে উঠলো বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। সাধারণ মানুষ থেকে স্কুলের ছাত্রদেরও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দেখা যেত।

সেসময় ইংরেজরা একটা নির্দেশ জারি করে যে, কেউ স্কুল, কলেজ বা অন্য কোনোখানেই বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে পারবে না। এরকম নির্দেশ জারি করার উদ্দেশ্য ছিল কারও মনেই যেন দেশাত্মবোধ জাগ্রত না হয় কিংবা স্বাধীনতার যে সংগ্রাম চলছিল সেই সংগ্রামে যেন সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্ররা যোগ দিতে না পারে।

কেশব তখন নাগপুরে নীল সিটি হাইস্কুলে পড়ে। একদিন হেড স্যার বললেন, কয়েকদিন পর একজন ইন্সপেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসবেন। তখন কেশবের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল যে, ইন্সপেক্টর যখনই শ্রেণীকক্ষে পরিদর্শনের জন্য ঢুকবেন তখনই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হবে। স্কুলের সব ছাত্রই ছিল কেশবের বন্ধু। তারা কেশবকে তাদের নেতা মনে করে। কেশব প্রতিটি শ্রেণীতে গিয়ে বলে দিল ইন্সপেক্টরকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়েই স্বাগত জানানো হবে।

নির্ধারিত দিনে ইন্সপেক্টর এলেন। তিনি হেডস্যারের সঙ্গে শ্রেণী পরিদর্শন করতে যান। তিনি যে শ্রেণীতেই যান, সেই শ্রেণীর ছাত্ররাই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে শুরু করে। হেডস্যার তো অবাক। এদিকে ইন্সপেক্টর রেগে লাল। এবার ইন্সপেক্টর হেডস্যারকে বললেন, কে এই কাজের সর্দার, তাকে খুঁজে বের করতে হবে। ইন্সপেক্টরের নির্দেশ মতো হেডস্যার সমস্ত ছাত্রকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাতে কোনো ছাত্রই কোনো উত্তর দেয় না। তখন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হলো।

স্কুল বন্ধ আছে আর এদিকে ছাত্রদের পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসছে। তারপর ছাত্রদের অভিভাবকরা অনুরোধ করলেন স্কুল খুলে দেওয়ার জন্য। স্কুল খোলার জন্য রাজি হলেও তার কিন্তু একটা শর্ত ছিল যে, স্কুলের সমস্ত ছাত্রকে ওইদিনের ঘটনার জন্য দোষ স্বীকার করতে হবে।

অনেকদিন বন্ধ থাকার পর সেদিন স্কুল খুলেছে। স্কুলে ঢোকার আগে স্কুল গেটের কাছে সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। হেডস্যার তাদের প্রশ্ন করছেন, তুমি কি অপরাধ করেছ? উত্তরে প্রত্যেক ছাত্র মাথা নেড়ে করে দোষ স্বীকার করে নিচ্ছে। এক-এক করে সব ছাত্র অপরাধ স্বীকার করছে আর হেডস্যার তাদের স্কুলের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন।

এবার কেশবের পালা। সে অপরাধ স্বীকার তো করলোই না বরং মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন সকলেই বুঝতে পারল, এই হচ্ছে আসল সর্দার। স্যার বললেন, তুমিই কি তাহলে এই কাজের গুরু? তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করে নাও, তা নাহলে তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। কিন্তু কেশব এই ঘটনার জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধ স্বীকার করতে রাজি নয়। বরং বলল, দেশমাতাকে বন্দনা করা কোনো অপরাধ নয়। শাস্তিস্বরূপ কেশবকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হলো।

পরবর্তীকালে কেশব তার মামার কাছে চলে যায়। সেখানে গিয়ে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেই বিদ্যালয় থেকে খুব ভালোভাবে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর কেশব ডাক্তারি পড়ার জন্য কলকাতা আসেন। সেখানে বিপ্লবী দলে নাম লেখান। ডাক্তারি পাশ করে স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেন। সেই কেশবই ১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই হলেন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

দীপমাল্য সাউ, পঞ্চম শ্রেণী
কলকাতা-৭।

জাতীয় উদ্যান

ব্যানারঘাটা

ব্যানারঘাটা জাতীয় উদ্যান কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরু ও রামানগর জেলায় আনেকাল পর্বতমালার পাহাড়ে অবস্থিত। ১০৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেএ ১৯৭৪ সালে জাতীয় উদ্যান রূপে ঘোষণা করা হয়। ২০০২ সালে উদ্যানের একটি ছোটো অংশকে প্রাণীবিদ্যা উদ্যানে পরিণত করা হয়। এই উদ্যানের ভেতরে ছটি গ্রাম রয়েছে। একটি প্রাচীন মন্দিরও রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে চিড়িয়াখানা, লায়ন সাফারি, টাইগার সাফারি ও প্রজাপতি উদ্যান। রয়েছে গৌর, বন্য শুয়োর, হাতি, ভালুক, শেয়াল, সম্বর হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, চিতাবাঘ প্রভৃতি। রয়েছে চন্দন, জালারি, তেঁতুল, নিম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ। এই উদ্যানের অঅকর্ষণ হলো সাপের খামার।

এসো সংস্কৃত শিখি-৬২

সপ্তমী বিভক্তি: – পুংলিঙ্গে

হস্ত: – **হস্তে**। (হাত– হাতে)
কণ্ঠ: – **কণ্ঠে**।
গ্রাম: – **গ্রামে**।
দণ্ড:। **হস্ত:**।
দণ্ড: হস্তে অস্তি। লাঠি হাতে আছে।
দণ্ড: কুত্র অস্তি ? লাঠি কোথায় আছে?
অভ্যাসং কুর্ম:--
চমস: চষকে অস্তি। শিক্ষক: বিদ্যালয়ে অস্তি। কাক: বৃক্ষে অস্তি।
চষক: আসন্দে অস্তি। ধনং স্যূতে অস্তি। করবস্ত্রম্ কোষে অস্তি।
প্রযোগং কুর্ম:
প্রকোষ্ঠ:, দেশ:, কূপ:, জলাশয়:, কার্যালয়:, কর্ণ:, সমুদ্র:, মার্গ:, মেঘ:, প্রদীপ:, ঘট:, মঞ্চ:।

ভালো কথা

দোল উৎসব

এবারও আমরা বীরেশ্বর শাখার স্বয়ংসেবকরা দোলের দিন খুব আনন্দে করলাম। প্রথমে আমরা শাখায় প্রার্থনার পর পরস্পরকে আবির মাখালাম। তারপর পাড়ায় বেরিয়ে স্বয়ংসেবকদের বাড়িতে বাড়িতে এবং রাস্তায়, দোকানে পরিচিতি সরলকে আবির মাখিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। রাস্তায় কাজ করা জমাদার ভাইদেরও আমরা আবির মাখালাম, তারাও আনন্দে আমাদের মাখিয়ে দিল। রাস্তায় অনেকে আমাদের চকোলেট বা মিষ্টি দিয়েছে। আমাদের দলে বড়োদের মধ্যে মহানগর প্রচারক নরেনদা আর আমাদের নগর কার্যবাহ অমিতদা সঙ্গে ছিলেন। আর কয়েকজন বড়ো দাদা ছাড়া আমরা বালক ও শিশুরাই বেশি ছিলাম। শিশু স্বয়ংসেবক দিব্য একটি পিচকারি এনেছিল। ওটা দিয়ে সবাইকে রং দিচ্ছিল। একসময় আমরা প্রান্ত সঙ্ঘচালক জয়ন্তদার বাড়ি গেলাম। ওখানে রং খেলার পর সবাই মিলে বসলাম। কাকিমা আমাদের মিষ্টি ও প্রসাদ দিলেন। তারপর আমরা ২৬ নং কার্যালয়ে এসে রং জল মেখে ভূত হয়ে গেলাম। তখন আর কেউ কাউকে চিনতে পারছিলাম না। তারপর ওখানেই ভালোভাবে স্নান সেরে বাড়ি ফিরে এলাম।

নীল সুর, দশম শ্রেণী, ৭/বি, বালক দত্ত লেন, কলকাতা-৭

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) জা ভা গু বে	(১) দ বা ং স বি দ বা বি
(২) ন পো গু ড়া	(২) ণী রি হা বি ন বৃ ব ন্দা

২৪ মার্চ সংখ্যার উত্তর
(১) প্রতিফলন (২) সকালবেলা

২৪ মার্চ সংখ্যার উত্তর
(১) দিগন্তরেখা (২) লোহিতসাগর

উত্তরদাতার নাম
(১) সমাদৃতা ঘোষ, ই বি, মালদা। (২) নীলাক্ষ পাণিগ্রাহী, মকদমপুর, মালদা।
(৩) সুকর্ণা দেব, গঙ্গারামপুর, দঃ দিনাজপুর। (৪) শ্রেষ্ঠা দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ঔরঙ্গজেব-দ্বেষ ভারতের স্ব-উপলব্ধির পুনরুদ্ধার

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

ঔরঙ্গাবাদের নাম পরিবর্তন করে ছত্রপতি শম্ভাজীনগর রাখার পর থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টি ও তাদের রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলির মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল স্বাভাবিক চাপান-উতোর ও বাকযুদ্ধ, যা চরমে ওঠে সাম্প্রতিকতম মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে। ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং এআইএমআইএম-এর তরফে আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে ঔরঙ্গাবাদের পুনর্নামকরণ নিয়ে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় চরম বিতর্কে। প্রত্যাশানুরূপভাবেই সমস্ত লেফট-লিবারেল পার্টিগুলি এহেন বিতর্কে সমর্থন করে এআইএমআইএম-কে এবং তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধাঁচে রচনা করতে থাকে বাদশা ঔরঙ্গজেবের গৌরবগাথা। সেই বাদশা যিনি হয়েছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান ও তাৎক্ষণিক কারণ। ভারতের লেফট-লিবারেলরা অবশ্য ঔরঙ্গজেবের মতো একজন কট্টরপন্থী, মহা-অত্যাচারী, প্রজানিপীড়ক, স্বৈরাচারী অথচ মহারাষ্ট্রে হেরো বাদশাকে মহিমান্বিত করার প্রয়াসে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

'হেরো' না হলে দিল্লির বাদশাকে দিল্লি ছেড়ে জীবনের এক দীর্ঘ সময় যাবৎ দাক্ষিণাত্যের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হলো কেন? আর কেনই-বা অমন সকলের অজ্ঞাতে, নিতান্ত অনানুষ্ঠানিকভাবে তিনি মারা গেলেন মহারাষ্ট্রে? দিল্লির বাদশা মহারাষ্ট্রে মরবেন কেন এবং যদি-বা মরেন, মহারাষ্ট্রে কবর পাতবেন কেন? আদতে মহারাষ্ট্রকে কবজা করার অদম্য জেদ অথচ সে কাজে চরম ব্যর্থতাই ঔরঙ্গজেবকে 'হেরো বাদশা'র তকমা দেওয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ন্যারেটিভের নানা পরস্পরবিরোধী কচকচিতে যাব না, কারণ ইতিহাস বিষয়টি মূলত ন্যারেটিভধর্মী, উপরন্তু এই প্রতিবেদিকা ইতিহাসের ছাত্রীও নয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে তাঁর সভাসদরা যা লিখে রেখে গিয়েছেন তখন তাঁর সময়কার প্রশাসনিক অর্ডারগুলির রেকর্ড যা কিছু আছে, তা থেকে ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের যে অবয়ব ফুটে ওঠে তা থেকে এককথায় বলা যায় যে বাদশা ঔরঙ্গজেব ছিলেন র‍্যাডিকালাইজড্। কট্টরপন্থার খাতিরে নিজের বাপ-ভাইদেরকেও রেহাই দেননি। কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে তাঁর চরিত্রে কোনো সদ্‌গুণ ছিল না।

সাম্প্রতিক অতীতে ঔরঙ্গজেরকে নিয়ে গোল বাঁধল 'ছাওয়া' ফিল্মটির রিলিজের পরে। লেফট-লিবারেল গোষ্ঠীর ঔরঙ্গজেব-স্তুতিও যেমন তারপর উঠল এক নতুন উচ্চতায়, তেমনি ভারতবর্ষের মানুষের মনের মধ্যে সুপ্ত ছত্রপতি শম্ভাজী মহারাজের চরম যন্ত্রণাময় আত্মবলিদানের স্মৃতিও হয়ে উঠল জীবন্ত এবং সেই সূত্রে ঔরঙ্গজেব-বিরোধী আবেগও হলো অন্তরমথিত, যার ফলে নাগপুরে ঘটে গেল এক জেহাদি আক্রমণের ঘটনা। ভুললে চলবে না সুবিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকারী ঔরঙ্গজেবও কোনোদিন মরাঠাদের বশ্যতা পাননি। বজরঙ্গ দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো হিন্দু সংগঠনগুলি যখন এককাট্টা হয়ে খুলদাবাদের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে ঔরঙ্গজেবের কবর সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাল এবং প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ঔরঙ্গজেবের কুশপুতুল পুড়িয়ে, তখনই কে-বা কারা যেন গুজব ছড়িয়ে দিল যে কোরানের আয়াত লেখা একটি পতাকাও নাকি পোড়ানো হয়েছে প্রতিবাদীদের দ্বারা এবং সেই গুজবকে সম্বল করেই কট্টর জেহাদিরা নাগপুরে শুরু করে দেয় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। বেছে বেছে নিরপরাধ সাধারণ হিন্দুদের গাড়ি ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার কাজ যা কিনা সংবাদমাধ্যমে রিপোর্টেড হয়েছে।

এমন ঘটনার পর ভারতবর্ষের হিন্দুদের এক বৃহৎ অংশের মনে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে

যে ঘৃণাবোধ আছে বা তাঁকে খলনায়ক মনে করার যে প্রবণতা আছে তার কড়া সমালোচনা করে লেফট-লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিত থেকে টাইমস্ অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন লেখেন ঔরঙ্গজেব গুণমুগ্ধ একজন লেখিকা। 'There is an increasing and disturbing, tendency to frame the violence in Indian history in terms of religion—Hindu and Muslim. India's history is a litany of wars that Hindu kings waged against each other. It is marred and marked by rapacious colonialism by the European powers. But no one is seeking to take revenge on a Chola emperor or going on a protest march against British PM Keir Starmer.' লিখেছেন তিনি।

কথা হলো চোল রাজারা ছিলেন ভারতীয় রাজা, নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও গরিমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের সমসময়িক অন্যান্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যাঁরা করেছিলেন প্রচুর যুদ্ধ। কিন্তু তা বলে সেই চোল রাজাদের উত্তরসূরীরা আজ আর কেউ অন্য সকল ভারতীয়দের এমন হুমকি দিচ্ছে না যে, 'একদা যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষেরা শাসন করেছে তোমাদের, তাই অদূর ভবিষ্যতে আবারও তোমাদের হতে হবে আমাদেরই পদানত এবং আবারও তোমাদের শাসন করব এই আমরাই।' এমন হুমকি চোল রাজাদের উত্তরসূরীদের দিক থেকে আজ আর না থাকলেও ঔরঙ্গজেবের উত্তরসুরী বলে নিজেদেরকে দাবি করে যারা, তাদের দিক থেকে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি এমন হুমকি শোনা যায় অহরহ। যুগটি সোশ্যাল মিডিয়ার হওয়ার বালির মধ্যে মুখ-কান গুঁজে রাখা উঠপাখিরাও অনায়াসে টের পায় এমন হুমকির অস্তিত্ব। সে হুমকির সারবত্তায় অধিকাংশ মানুষই তেমন বিশ্বাস না করলেও সময়ে সময়ে, নানা ছুতোয় ঔরঙ্গজেবের স্বঘোষিত উত্তরসূরীদের দেখতে পাওয়া যায় পথে নেমে জেহাদি শত্রুর রূপ ধারণ করতে, যেমন দেখা গেল নাগপুরে, মালদায়, মুর্শিদাবাদে।

উপরন্তু পরিধেয় বস্ত্র থেকে আজকের ভারতবর্ষে চোল রাজাদের বর্তমান উত্তরসূরীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারা না গেলেও, ঔরঙ্গজেবের স্বঘোষিত উত্তরসূরীদের তাদের পরিধেয় বস্ত্র দেখেই চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না। তাই চোল রাজাদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের তুলনা করে যে বা যারা, তাদের অস্তিত্ব আদতে বিভাজনোত্তর ভারতবর্ষের কাপুরুষতার প্রতীক। ১৯৪৭ সালে এদেশের বিভাজনের মাধ্যমে বাদশা ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকার বুঝে নেওয়ার পরেও সে ঔরঙ্গজেবের কবরটি অবস্থান করছে এদেশেই সে সত্যও বিভাজনোত্তর ভারতবর্ষের নপুংসকতার দ্যোতক। ১৯৪৭ সালের পরেও এদেশে ঔরঙ্গজেবের স্তুতিগাথা গাওয়া আদতে ভারতদ্রোহ এবং এদেশের বহু সহস্রাব্দের প্রাচীন ইতিহাসের চরম অপমান বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। 'অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে'।

চোল রাজারা কোনোদিন দেউলিয়া হয়ে যায়নি। তাঁদের সাম্রাজ্য ছিল মহাসমৃদ্ধিশালী এবং প্রজারাও ছিলেন ধনী, সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। চোলেরা সাধারণ প্রজার গণহত্যায়ও কোনোদিন প্রবৃত্ত হননি, কারণ ভারতবর্ষে যুদ্ধও ছিল নীতিভিত্তিক, যুদ্ধের নামে সাধারণ প্রজার গণহত্যা ভারতীয় রাজারা করেননি। মহাকাব্যও দেখিয়েছে যে কংসের মতো অত্যাচারী রাজার প্রতিকারার্থে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বয়ং ভগবান। অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী রাজা প্রজারঞ্জন করবেন, অত্যাচার করবেন না। উপরন্তু চোল রাজারা ধ্বংস করেননি বিজিত রাজ্যের মানুষের আস্থার প্রতীক বা তাঁদের আস্থা সম্বন্ধীয় স্থাপত্যগুলিও। অথবা প্রজাদের উপর চাপাননি অতিরিক্ত খাজনার ভারও, যেমনভাবে প্রজাদের উপর জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব। বরং চোল শাসনকাল ছিল ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় যে সময়ে সমৃদ্ধি এসেছিল শুধু সম্রাটের কোষাগারে নয়, সাধারণ মানুষের গৃহেও। তাহলে চোল রাজাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রতিশোধের ম্যনোভাব সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে থাকবে কোন যুক্তিতে?

প্রতিশোধস্পৃহা যদি আদৌ থাকে, তবে তা হওয়া উচিত ইতিবাচক, নেতিবাচক নয়। ঔরঙ্গজেব ছিলেন এতখানিই কট্টর যে তার জেদের বশে কোষাগার শূন্য করে ফেলেছেন বুঝতে পারা সত্ত্বেও মরাঠাদের বিরুদ্ধে অনবরত নিষ্ফল যুদ্ধ করা থেকে নিজেকে ঠেকাতে পারেননি। যে নিষ্ফল যুদ্ধ প্রায়-দেউলিয়া ও ধ্বংস করে ছেড়েছিল তাঁকে ও মুঘল সাম্রাজ্যকে। মহারাষ্ট্রের ওই স্থানে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু যখন হয় তখন তাঁর হাতে অর্থবল বলতে ছিল না প্রায় কিছুই। লেখিকা লিখেছেন, 'If his father Shah Jahan built the most magnificent mausoleum, the Taj Mahal, Aurangzeb wanted a simple, unadorned grave open to the skies for himself. It is just a few feet of mud, a sapling in the middle.' প্রশ্ন হলো, ঔরঙ্গজেবের কবরটি যে এতখানি সাদাসিধে তা কি তিনি নিজের জন্য এই প্রকার সাদাসিধে কবর চেয়েছিলেন বলে নাকি তাঁর হাত তখন শূন্য হয়ে গিয়েছিল? যে ঔরঙ্গজেব নিজের স্ত্রীর কবরের উপর তাজমহলের আদলে 'বিবি কা মকবারা' নির্মাণ করিয়েছিলেন, তিনি সকল বিষয়েই সাদাসিধে ছিলেন এমন কথা কি বলা চলে? বাস্তবে বাদশা ঔরঙ্গজেবের অবস্থা মৃত্যুকালে হয়েছিল রসহীন শুকনো আখের ছিবড়ের মতো। ক্রমাগত যুদ্ধে এবং যুদ্ধকৌশলের অভিনবত্বে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মরাঠারা ঔরঙ্গজেবকে বিধ্বস্ত করে ছেড়েছিল কেবলমাত্র ধনে-মানে নয়, মনেও। কারণ যে কট্টরতা নিয়ে সমস্ত কাফিরদের বশ মানানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন ঔরঙ্গজেব, মহাশক্তিশালী ও মহাহিংস্র মুঘল সৈন্যের শত প্রয়াস সত্ত্বেও সেই কাফিরদের বশ হতে না দেখার অপরিসীম মানসিক ধাক্কাও ঔরঙ্গজেব ও মুঘলদেরকে দিয়ে ছেড়েছিল মরাঠারা। যে ধাক্কা সামলে উঠতে না পারা এবং অনবরত যুদ্ধে মুঘল কোষাগারের দৈন্যদশার জন্যই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের তাৎক্ষণিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে হেরো বাদশা ঔরঙ্গজেব। তাই কোনো প্রতিশোধস্পৃহা যদি ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে থেকেও থাকে, তবে তা চরিতার্থ করার পথ ভিন্ন। সেই মজহবের উন্মত্ততার যন্ত্রণায় সমস্ত জীবন ধরে ভুগেছিলেন বাদশা নিজে এবং ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে করার প্রয়াস করেছিলেন যে ধর্মান্ধতার চাষ। ভারতবর্ষের একটি মানুষের মধ্যেও যেদিন বাঁচবে না সেই মজহবের

অনুভূতির কণামাত্রও, সেই দিন, একমাত্র সেইদিনই, ইতিবাচকভাবে চরিতার্থ হবে মরাঠাদের দ্বারা পরাজিত বাদশা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিশোধস্পৃহা। যদিও এমন লক্ষ্যকে প্রতিশোধের লক্ষ্য আদৌ বলা যায় কি না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিশোধ তো এইপ্রকারই হবে! সে তো আর ঔরঙ্গজেবের প্রতিশোধপদ্ধতির মতো হবে না।

ঔরঙ্গজেব যে ভয়াবহ নিপীড়ক এক স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন, তার একখানি সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মানী' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেও। 'আওরঙ্গজেব ভারত যবে করিতেছিল খান খান'— যদিও এ কবিতা আদতে ঔরঙ্গজেবের একখানি প্রশংসার্হ আচরণকে বর্ণনা করেই রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু প্রথম লাইনেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ঔরঙ্গজেব আদতে তলোয়ারের আঘাতে টুকরো টুকরো করছিলেন ভারতবর্ষকে। অতপর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার মুসলমানরা দাবি করে বসে যে 'মানী' কবিতার ওই প্রথম লাইনটিই আঘাত করেছে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে। ফলে রবীন্দ্রনাথকে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ঔরঙ্গজেব গোড়া থেকেই ছিলেন কট্টরপন্থী ও কাফির-নির্যাতনের প্রতীক-পুরুষ বা পোস্টারবয়। প্রফুল্ল কেতকর অর্গানাইজারের সাম্প্রতিকতম সংখ্যাটিতে অসাধারণ সম্পাদকীয় লিখেছেন যে 'Aurangzeb represents the ideology of iconoclasm and intolerance of the highest order as per the historical records.'

ভারতীয়দের ক্ষোভ যদি ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে থেকে থাকে তাহলে বর্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কের স্টার্মারের বিরুদ্ধেও তাদের থাকা উচিত অনুরূপ ক্ষোভ এবং তাঁর বিরুদ্ধেও ভারতীয়দের উচিত প্রতিবাদ মিছিল করা। কারণ ব্রিটিশরাও একদা ভারতবর্ষের বুকে কায়েম করেছিল ঔপনিবেশিক শাসন— লেখিকার এমন প্রতিপাদ্যটি কৌতুকাবহ। বর্তমান ভারতীয়দের কাছে ঔরঙ্গজেব ও কের স্টার্মার যে পরস্পর-তুলনীয় নন এবং দু'জনকে তুলনা করলে যে একটি আপেলের সঙ্গে একটি টমেটোর তুলনা করা হয় সেইটি যে লেখিকা অনুধাবন করতে পারেন না তা বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব। একদিকে যেমন দুই ব্যক্তি ঐতিহাসিকভাবে সমসাময়িক নন। অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষের সম্পর্কও দু'জনের সঙ্গে দুই প্রকারের। একদিকে যেমন কের স্টার্মার বর্তমান সময়ের একজন ব্রিটিশ রাজনীতিক যাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক সরকারি স্তরের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিনা অন্য কিছু নয়, অন্যদিকে তেমন ঔরঙ্গজেব ছিলেন ভারতের একদা-শাসক যিনি শাসন করেছিলেন ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশকে যা ছিল সেই সময়ে তাঁর ভৌগোলিক সাম্রাজ্য এবং সেই সূত্রে তিনি আজও শুয়ে আছেন ভারতবর্ষের মাটির নীচে তাঁর কবরে। অথচ বড়লাট কর্নওয়ালিস ব্যতীত ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় পদবাচ্য রাজপুরুষেরা কেউই এদেশের মাটিতে নিজেদেরকে কবরস্থ করেননি। ভারত যেখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং ব্রিটিশেরা এ দেশ থেকে দপ্তর গুটিয়ে, আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়েছিল ১৯৪৭ সালে, মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের মরদেহ সেখানে আজও শায়িত রয়েছে এদেশের মাটির নীচে এবং এদেশের একশ্রেণীর মুসলমান আজও লালন করতে চায় মোঙ্গলদস্যুদের সেই বর্বর বৃত্তি গ্রহণের। তারা এদেশের মাটিতে মজহবি উন্মাদনার সেই জান্তব অনাচারের পুনরারম্ভের দিবাস্বপ্ন দেখে। এই সকল তিক্ততার অবসানার্থে মুঘল-মানসিকতাকে বিদায় নিতে হবে ভারতবর্ষ থেকে, ঠিক যেমন বিদায় নিয়েছিলেন কের স্টার্মারের পূর্বপুরুষেরা।

ব্রিটিশেরা গিয়েছিল ভারতবর্ষকে টুকরো করে দিয়ে। এ কাজে ব্রিটিশকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতা করেছিল ভারতের মুসলমানরা। তৎসত্ত্বেও অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের ৯৫ শতাংশ মুসলমান পাকিস্তান গঠনের পক্ষে ভোটদান করার পরেও পাকিস্তানের জন্মের পর পাকিস্তানে তাঁরা গেলেন না, বরং রয়ে গেলেন বিভাজনোত্তর ভারতভূমিতেই এবং আজও বাদশা ঔরঙ্গজেবের কবর খুলদাবাদ থেকে সরানোর কথা শুনলে তাঁরা পেশী প্রদর্শন করার এবং ভারতের হিন্দুদের আক্রমণ করার সাহস করেন। ঔরঙ্গজেবের ভূত তাঁদের উপর সওয়ার আর বিভাজনোত্তর ভারতবর্ষ আজও পারেনি এই ভূত তাড়ানোর ওঝাকে ময়দানে নামাতে! সহিষ্ণুতার নামে কাপুরুষতার আর কত প্রমাণ চাই? অথচ ভারতবর্ষ হলো দেবাদিদেব শিবের ভক্তদের দেশ।

ইসলামপূর্ব কালেও ভারতবর্ষের নানা রাজ্যের রাজারা ক্ষাত্রধর্ম পালনার্থে হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের মধ্যে লিপ্ত হয়েছেন অসংখ্য যুদ্ধে। ভারতবর্ষের মহাকাব্যিক ইতিহাসও ভয়াবহ সব যুদ্ধেরই ইতিহাস। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ পরিণত হয়েছিল শ্মশানে। অতএব ভারতবর্ষ মাত্র ৭৫ বছর আগে একটি নেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে যে দাবি 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র প্রতিবেদনটিতে লেখিকা করেছেন, তাতে তিনি হয়তো ভুলেই গিয়েছেন যে মহাভারত যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল অখণ্ড বৃহত্তর ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের প্রায় সকল রাজ্য। 'নেশন' বোধ না থাকলে কেন তাঁরা সকলে অংশ নিয়েছিলেন সে যুদ্ধে? বস্তুত, একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হতে এবং পরাজিত রাজ্যের উপর নিজেদের গরিমা প্রতিষ্ঠার্থে রক্তপাতে কখনো কার্পণ্য করেননি ভারতবর্ষের নৃপতিরা। কিন্তু জয়-পরাজয় নির্বিশেষে সেই যুদ্ধগুলি কোনো রাজ্যেরই প্রজা সাধারণের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব ও জীবনবোধকে বিপন্ন করেছে বলে জানা যায় না। রাজারা যুদ্ধ করেছেন সাম্রাজ্য বিস্তার ও পরাজিত রাজ্যের আনুগত্য বাবদ সে রাজ্য থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব লাভের উদ্দেশ্যে। পরাজিত রাজ্যের নারীরত্নদের মর্যাদাহরণ করার উদ্দেশ্যে নয়। নারীকে পণ্য মনে করার ভাবধারাটি ভারত সংস্কৃতির বিপরীতধর্মী ভাবধারা। যুদ্ধজয়ের পর বিজিত রাজ্যের নারীর সম্মান লঙ্ঘন করার বিষয়টি ভারতীয় রাজারা কল্পনাতেই আনেননি যে কদর্যতা তাঁরা প্রথম প্রত্যক্ষ করেন ইসলামি আক্রমণের সময়। গজনির মামুদকে দেখেই ভারতবর্ষ প্রথম জেনেছিল যে নারীকে যৌনপণ্য হিসেবে ব্যবহার ও বেচা-কেনা করা যায়। সে ঘোর অন্যায়ের প্রতিকার ভারতবর্ষ আজও করতে পারেনি। যে ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যই করেছে নারীর অসম্মানের প্রতিবাদে যুগান্তকারী যুদ্ধের বর্ণনা, সেই ভারতবর্ষই নারীর যৌন পণ্যায়ন ও নারী নির্যাতন নিয়ে

গত হাজার বছর ধরে চুপ।

মোঙ্গল দস্যুদের সকলের মধ্যেও ঔরঙ্গজেব হয়তো ছিলেন ক্রূরতম সেই শাসক যিনি কেবলমাত্র তলোয়ারের আগায় সম্পদ আহরণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং কট্টর ধর্মান্ধতাবশত ঘটিয়েছেন হিন্দুদের অকল্পনীয় সব গণহত্যা, তাঁদের ধর্মসাংস্কৃতিক মূলবোধ মুঘলদের অপেক্ষা পৃথক ছিল বলে তাঁদের উপর চাপিয়েছেন অতিরিক্ত কর (জিজিয়া), ধ্বংস করেছেন একের পর এক শিক্ষাকেন্দ্র, গুরুকুল, মন্দির আর সে মন্দিরের মাথায় চাপিয়ে গিয়েছেন মসজিদের টুপি এবং শেষত, ভারত সভ্যতার মর্যাদাবোধের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে ভারতের নারীদের উপর যে কোনো প্রকার নিপীড়ন চালানোর জন্য নিজ সেনাবাহিনীকে দিয়েছেন পূর্ণ স্বাধীনতা। গজনির মামুদের দ্বারা যে ঘোর অন্যায়ের শুরু, ঔরঙ্গজেব সময় সেই পাপের ঘড়া হয় প্রায় পূর্ণ। এককথায় বলতে গেলে ভারতবর্ষের আত্মাকেই যেন পিষ্ট করতে চেয়েছিলেন মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব।

ভারতবর্ষের রাজাদের নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধ এবং ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে ঔরঙ্গজেব বা টিপু সুলতানের মতো বহিরাগত আক্রমণকারীদের যুদ্ধের প্রভেদও ছিল এইখানেই যে ঔরঙ্গজেবরা কেবলমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করে তুষ্ট হননি। ভারতসভ্যতার মূল্যবোধকে অন্তরে ধারণ করে ভারতবর্ষের একজন হতে তাঁরা চাননি, বরং পিষে দিতে চেয়েছেন হিন্দুদের আধ্যাত্মিক আস্থা ও ঐতিহ্যকে, ধ্বংস করেছেন এদেশে প্রাচীন জ্ঞান ও পুঁথির ভাণ্ডার এবং সর্বোপরি ভারতবষের নারীদের দিকে তাকিয়েছেন যৌনপণ্যের দৃষ্টিতে।

যাঁরা ভাবছেন ও বলছেন যে ঔরঙ্গজেবের মতো শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তৈরি হলে অসংখ্য জাতপাতে বিভক্ত ভারতীয় সমাজের 'নীচু জাত'-এর মানুষেরাও 'উঁচু জাত'-এর মানুষদের উপর হয়ে উঠতে পারেন বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ, তাঁদের মনে রাখা প্রয়োজন যে যত অসংখ্য জাতপাতদীর্ণই ভারতীয় সমাজ হোক না কেন, ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়েছিল রিলিজিয়নের ভিত্তিতে, জাতের ভিত্তিতে নয়, যা প্রমাণ করে যে জাতের অস্তিত্ব ভারতবাসীর সামগ্রিক অস্তিত্ব চেতনাকে বিদীর্ণ করতে পারেনি, কিন্তু বিকট রিলিজিয়নের কুৎসিত থাবা দেশকে করে ফেলেছিল দ্বিখণ্ডিত, অথচ সে খণ্ডনকার্য আজও হয়নি সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যার মূলে বুঝি-বা রয়েছে এদেশের অস্তিত্বের এই অসম্পূর্ণ দ্বিখণ্ডিত। রিলিজিয়নের ভিত্তিতে তার ভূখণ্ড হয়েছে বিভাজিত, কিন্তু জনগোষ্ঠীর বিন্যাসে সে আজও রয়ে গিয়েছে অবিভাজিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, অখণ্ড ভারতভূমিই বুঝি-বা আজ ভুগছে স্কিজোফ্রেনিয়ায়। এই অসম্ভব অন্যায়ের প্রতিকারসাধন না করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

ভারতবর্ষ নামক সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডটির ক্ষতি যা কিছু হয়েছে তা হয়তো হয়েছে মূলত দুটি প্রধান কারণে। (১) ৭৫০ বছর ব্যাপী নারীবিদ্বেষী বর্বরতা যার দুষ্প্রভাব ভারতবর্ষের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি ও পরস্পরকে করে তুলেছে বিকৃত এবং (২) ২৫০ বছরব্যাপী আর্থিক ও বৌদ্ধিক শোষণ যা মানুষের মধ্যে জন্ম দিয়েছে গভীর আত্মবিস্মৃতি। বাদশা ঔরঙ্গজেব সেই ৭৫০ বছরের নারীবিদ্বেষী বর্বর ধর্মান্ধতার প্রতীক। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ আদতে বিভাজনোত্তর ভারতবর্ষের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার বিরুদ্ধে ওঠা ভারতবাসীর প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদ আদতে আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষের স্ব-উপলব্ধি পুনরুদ্ধার এবং স্ব-অভিমানের পুনরোপলব্ধির সূচক বলেই মনে হয়। □

পূর্ণকালীন স্বেচ্ছাসেবী তরুণ-তরুণীর প্রতি আহ্বান

'অপরের সেবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারে, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, অনুগত— এমন যুব সম্প্রদায়ের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। আমার আদর্শ রূপায়ণে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারে, যাতে তাদের নিজেদের কল্যাণ এবং একই সঙ্গে বৃহত্তরভাবে রাষ্ট্রেরও কল্যাণকারী হবে'— স্বামী বিবেকানন্দ

- স্বামীজী যেরকম স্বপ্ন দেখেছিলেন সেইভাবে দেশসেবার কাজে আপনার কি আগ্রহ আছে?
- আপনি কি রাষ্ট্রের উত্থান দেখে, সাফল্য দেখে আনন্দিত হন? সাধারণ মানুষের সংগ্রামে ব্যথিত হন? আপনি কি গ্রাম ও বস্তিতে নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের জন্য সেবাকাজে ইচ্ছুক? আপনি কি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে চান?
- যোগ জীবন চলার এক পথ— আপনি কি এই বিষয়ে জানতে, অভ্যাস করতে, প্রচার করতে আগ্রহী?
- আপনি যদি অবিবাহিত, উদ্যমী তরুণ বা তরুণী হন, ঘর, পরিবার ছাড়তে প্রস্তুত থাকেন, রাষ্ট্রসেবার কাজে, দেশের কাজে যে কোনো প্রান্তে যেতে রাজি থাকেন, কেন্দ্র আপনার থাকা খাওয়ার ব্যয়ভার বহন করবে।
- যদি প্রস্তুত থাকেন কমপক্ষে দু-বছরের জন্য পূর্ণকালীন, নিবেদিতপ্রাণ, অবৈতনিক কার্যকর্তা হিসেবে যোগদানের জন্য তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করতে পারেন।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত,
X3, First Floor, ৭৬/২, **বিধান সরণি, কলকাতা** - ৭০০ ০০৬
মোবাইল : ৯৪০৩৬২৫২২৩, ৯৮৩০২৩৩৮১৪
Kolkata@vkendra.org

কয়েকটি সত্য কথার অবতারণা

শিতাংশু গুহ

১. তুলসী গ্যাবার্ডের বক্তব্য সঠিক ও সত্য। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু ওপর অত্যাচার চরমে উঠেছে, ইসলামি সন্ত্রাসবাদ জাঁকিয়ে বসেছে এবং এরা 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৃশংস পথে এগুচ্ছে। ১৮-টি ইন্টিলিজেন্স সংস্থা নিয়ে গঠিত 'ডিএনআই' (ডিপার্টমেন্ট অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স)-র ডিরেক্টর মিস গ্যাবার্ড যা বলেছেন সেটি হোয়াইট হাউসের বক্তব্য, ডিএনআ'র তথ্য-উপাত্ত'র সারসংক্ষেপ। এটিকে 'হাসিয়া উড়াইয়া' দেওয়ার সুযোগ নেই। ছোটোবেলায় ভাবসম্প্রসারণ পড়েছিলাম যে, 'অমঙ্গলকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে'। ড. ইউনুস প্রশাসন তুলসীর বক্তব্যের প্রতিবাদ ও নিন্দা করে সম্ভবত নিজেই 'উড়িয়া যাইবার' পথটি আরও একটু সুগম করলেন। পতনের সময় এলে মানুষ এরকম ভুল করে। এটি সত্যি যে ইউনুসের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। সামনের দিনগুলোতে তিনি হয়তো ফ্রান্সে গিয়ে পিনাকী'র সঙ্গে গলা জড়িয়ে কান্নাকাটি করতে পারেন।

২. ৯ মাস, পর সুনীতা ইউলিয়াম পৃথিবীতে ফিরেছেন। পুরো বিশ্ব ৪ জন মহাকাশচারীর ফিরে আসাকে স্বাগত জানিয়েছে, সবার মাঝে এক ধরনের আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান তোষণকারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও এ সংবাদে খুশি। তিনি সুনীতাকে 'ভারতরত্ন' পুরস্কার দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন। সুনীতা বলেছেন 'অক্সফোর্ডে পিসি'র ভাষণ শুনবো বলেই তো আমি তড়িঘড়ি পৃথিবীতে চলে এলাম'। সুনিতা অনেকদিন পৃথিবীতে ছিলেন না, সব খবর ঠিকমতো তাঁর কাছে পৌঁছয়নি। তিনি হয়তো তৃণমূলের অপপ্রচার শুনেছেন যে, পিসি অক্সফোর্ডে ভাষণ দিচ্ছেন। সুনীতা যখন জানতে পারলেন যে পিসি অক্সফোর্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি অখ্যাত কলেজে ভাষণ দিয়েছেন, তখন তিনি হতোদ্যম হয়েছেন।

৩. বাংলাদেশের ড. মহম্মদ ইউনুস বলেছেন যে, 'হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক। একই সময়ে তাঁর ধর্ম উপদেষ্টা বলেছেন, 'যেভাবে বলা হচ্ছে, সে মাত্রায় অত্যাচার হয়নি। এই উপদেষ্টাই ক'দিন আগে বলেছিলেন যে, 'হিন্দুদের হয়রানি সাম্প্রদায়িক নয় বরং এটি রাজনৈতিক'। বস্তুত, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন একটি 'ওপেন সিক্রেট'। ইউরোপ, আমেরিকা, জাতিসঙ্ঘ বহুবার এটি বন্ধের আহবান জানিয়েছে। কিন্তু এটি থামছে না। এ সময়ে ইসকনের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে বন্দি। এটি কি রাজনৈতিক, নাকি তিনি হিন্দু বলে? হিন্দু মন্দিরে আক্রমণ বা মূর্তি ভাঙচুর সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন। হিন্দু গায়ক রাহুল আনন্দের বাড়িতে আক্রমণ এবং তাঁকে উচ্ছেদ অথবা ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, কারণ তারা হিন্দু। হিন্দু বলেই ১৯ বছরের যুবক উৎসব মণ্ডলকে থানার ভেতর পুলিশ, সেনাবাহিনীর সামনে মাদ্রাসা ছাত্ররা পিটিয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। হিন্দু হয়ে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করায় রবি দাসকে জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এ সবগুলো সাম্প্রদায়িক ঘটনা, রাজনৈতিক নয়। প্রধান উপদেষ্টা, ধর্ম উপদেষ্টা ও জামাতের আমির একাধিকবার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছেন, হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাগুলো সাম্প্রদায়িক বলেই, তাই না?

৪. এ সময়ে বাংলাদেশের ছোট্টো মেয়ে আছিয়ার নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে উত্তাল, মানুষ ন্যায়বিচার চায়। বাংলাদেশে মেয়েরা আর নিরাপদ নয়। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন পাকিস্তানের চেয়ে খারাপ। মানুষ ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। সরকার 'মব-জাস্টিস'- কে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চাইছে। টোকাইরা নতুন দল গড়েছে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর 'জাগপা' গঠিত হয়েছিল, টেকেনি। এনসিপি' টেকার কথা নয়। সাধারণ মানুষ বর্তমান দমনমূলক শাসনব্যবস্থায় ক্লান্ত। গণহত্যা-ধর্ষণ, ধর্মীয় উন্মাদনা পুরো দেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। মানুষ অধীর আগ্রহে পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে, কারণ এই সরকার কেবল অবৈধই নয়, অযোগ্য এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে অপরাধী। □

এবারে শাসক দলের অন্দরেই কি বিদ্রোহের আগুন?

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যে শাসক দলের দ্বিধাবিভক্ত অন্দর মহলের অবস্থা দেখে কি চিন্তিত সুপ্রিমো, নাকি অন্য খেলায় মাততে চলেছেন রাজ্যের শাসক দলের সর্বোময় কর্ত্রী? বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই শাসক দলের অন্দর মহলে যেমন চর্চা চলছে, তেমনি রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা চলছে। কারণ নানা ইস্যুতে দিশেহারা রাজ্যের শাসক দল ইতিমধ্যেই সেই গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই যে হারিয়েছে, সেটা বেশ বুঝতে পারছেন রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো। সেকেন্ড ইন কম্যান্ড তাঁকে কোণঠাসা করতে চেয়েছিল সেটাও তিনি বুঝেছেন তাঁর সঙ্গে থাকা শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে। এটা রাজনৈতিক মহলের অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেদিক দিয়ে একটু হলেও সেকেন্ড ইন কম্যান্ডকে সামান্য হলেও দূরে সরিয়ে রেখে, একটা অন্য রকমের ভাবমূর্তিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় রয়েছেন সুপ্রিমো। এদিকে রাজ্য জুড়ে কানাঘুসো শোনা যাচ্ছে যে, আগামী ২০২৬-এর নির্বাচনে অনেক জেতা প্রার্থী টিকিট পাবেন না। ফলে সেই বিদ্রোহ কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, সেটা নিয়েও নাকি স্ট্রাটেজি ঠিক করতে ইতিমধ্যেই শাসক দলের একেবারে সুপ্রিমো ঘনিষ্ঠদের মধ্যে হালকা আলোচনাও শুরু হয়েছে।

তাঁর কারণ, বেশ কিছু টালমাটাল বিধায়ক, কম মার্জিনে জেতা বিধায়ক, জনগণের সঙ্গে জনসংযোগে বিচ্ছিন্ন বিধায়ক এবারে যেমন টিকিট পাবার ক্ষেত্রে একটু হলেও পিছনের সারিতে থাকবেন, তেমনি অঞ্চলে প্রভাবশালী নেতাদের সুযোগ পাবার যে দৌড়, সেটা সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের গ্রুপের পক্ষ থেকে একটা চাপের সৃষ্টি করবে। যেটা এবারের শাসক দলের কাছে একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। যাঁদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করছে, যাঁদের ইতিমধ্যেই জেলের গরাদে কাটিয়ে আসতে হয়েছে, যারা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত, তাঁদেরকেও টিকিট দেবার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে হবে বলে একটি সূত্র জানাচ্ছে। এদিকে গায়ের জোরে ভোটে জেতা যে এবার সম্ভব হবে না, সেটাও হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছেন শাসক দলের সুপ্রিমো। কেননা, সারা রাজ্যে তাঁর বিরোধী যে হাওয়া বইছে, সেটা সাইক্লোন হয়ে প্রতিরোধের আগুন যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত বাধাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে, সেটা এখন থেকেই পরিষ্কার।

শাসক দলের সুপ্রিমো এটাও জানেন যে, তিনি যখন ২০১১-তে ক্ষমতায় এলেন, সেই সময় শাসক বিরোধী হাওয়া তীব্র ছিল। তিনি এসেছিলেন একজন প্রতিবাদী দলের মুখ হিসেবে। ৩৪ বছরের বাম জমানার অবসান হয়েছিল। গত ১৪ বছরে বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সেই জমানার থেকেও অনেক খারাপ অবস্থায় রাজ্যকে নিয়ে গেছেন। রাজ্যের ঋণের বোঝা বেড়েছে। বেড়েছে বেকারের সংখ্যা, শিল্পায়নের ভাওতাবাজি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিম্নগামী, নিয়ন্ত্রণ নেই বাজারে, দুষ্কৃতী তাণ্ডব ও দুর্নীতির এক স্বর্গ রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ। এটা তিনি বিদেশে গিয়েও সাম্প্রতিককালে টের পেয়েছেন। সারা বিশ্বে তাঁর রাজ্য নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এই কটি বিষয়। ফলে এগুলিকে সামাল দেবার মতো ক্ষমতা যে সুপ্রিমের নেই সেটাও তিনি জানেন। কেননা তাঁর দলের নীচুতলা থেকে উপরমহল পর্যন্ত, কোনো নিয়ন্ত্রণ আর তাঁর হাতে নেই। নিজের পরিবারের মধ্যেই থাকা সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে নিয়ে, এবারের অন্দরমহলের বিদ্রোহ সামাল দেবার চেষ্টা করে চলেছেন বলে একটি সূত্র জানাচ্ছে। সেদিক দিয়ে প্রার্থী ঠিক করার সময় আবার মতবিরোধ যে হতে পারে, সেটাও ওই সূত্র জানাচ্ছে।

রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, যেভাবে সাধারণ মানুষ তাঁকে এনেছিলেন, সেভাবেই তাঁকে ছুড়ে ফেলে দেবেন। ফলে রাজ্যের শাসক দল এই মুহূর্তে অনেকটাই দিশেহারা।

২০২৬-এর নির্বাচনে বিজেপির যে প্রবল হাওয়া বইছে সেটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার। কেননা বাম ও কংগ্রেসের সংগঠন জোট যাই বলা হোক না কেন, একেবারেই জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর ওপর রাজনৈতিক মহলের একটি সূত্র বলছে, বাম ও কংগ্রেসের মনোভাব বিজেপিকে ঠেকানো, সেই লক্ষ্যে যে তাঁরা পরোক্ষে তৃণমূলের পাশে দাঁড়াতে একটুও পিছপা হবে না, সেটাও পরিষ্কার। আর রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো এটাও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, যেভাবে সাধারণ মানুষ তাঁকে এনেছিলেন, সেভাবেই তাঁকে ছুড়ে ফেলে দেবেন। ফলে রাজ্যের শাসক দল এই মুহূর্তে অনেকটাই দিশেহারা অবস্থায়। যতই শাসক দলের সুপ্রিমো থেকে সবাই গলা ফাটিয়ে বলছেন, ২০২৬-এ তাঁরাই আবার আসছেন। সেই আসাটা কি অত সহজে হবে? এই গ্যারান্টি কোথায়? আবারও ঘুরে ফিরে আসে একটাই কথা, ২০২৬-এ যদি কঠোর নিরাপত্তায় ভোট হয়, তাহলে শাসক দলের বিদায় আসন্ন। মানুষ অপেক্ষা করছে সেই দিনের।

মালদহের মোথাবাড়িতে হিন্দুদের উপর নির্মম জেহাদি অত্যাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৬ মার্চ মালদহ জেলার মোথাবাড়ি-স্থিত রায়পাড়া মাঠে শ্রীশ্রী রামচন্দ্র পূজা কমিটি-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা। কমিটি-র কার্যকর্তা ছিলেন সুমন রায়, কৌশিক রায় ও বিবেক মণ্ডল। এদিন রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য প্রায় ১৫০ জন রামভক্তের শোভাযাত্রা নির্গত হয়। মোথাবাড়ির চৌরাস্তা মোড়ে একটি ৫ তলা মসজিদ রয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় শোভাযাত্রাটি শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মসজিদের সামনে দিয়ে যায়। তার এক ঘণ্টা বাদে মুসলমানরা ঘোষণা করে যে, শোভাযাত্রা থেকে মসজিদের ভিতরে বাজি ছোড়া হয়েছে। তার প্রতিবাদে পরের দিন মোথাবাড়ি পিডব্লুডি মাঠে সব মুসলমানকে জমায়েত করার জন্য মাইকিং করে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মসজিদ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

পরের দিন, অর্থাৎ গত ২৭ মার্চ, স্থানীয় টোটো ইউনিয়নের চেন মাস্টার মেহেতাব আলি ও মহম্মদ গোলামের নেতৃত্বে প্রায় হাজার দুয়েক জেহাদি পিডব্লুডি মাঠে জড়ো হয়। এই দুই নেতার উস্কানিতে উন্মত্ত জেহাদিরা হিন্দুদের উপর, হিন্দুদের দোকানের উপর লাঠি-বাঁশ নিয়ে আক্রমণ করে। হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ভেঙে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মোথাবাড়ি চোরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা হিন্দুদের গাড়ি এবং রাস্তায় চলন্ত ওঁ বা হিন্দু-স্টিকারযুক্ত গাড়ি দেখে দেখে তারা আক্রমণ চালায়। গাড়িগুলিতে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে। জেহাদিদের আক্রমণে গাড়ি চালক, দোকানদার, ছানা ব্যবসায়ী, পথচারী-সহ প্রায় ১০০ জন হিন্দু আক্রান্ত ও আহত হন। আহতদের মধ্যে ছানা ব্যবসায়ী বুবাই ঘোষ ও সুধাংশু ঘোষ গুরুতর আহত হয়ে মালদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জেহাদিদের জমায়েতের সময় থেকে তাদের হামলা পর্যন্ত সর্বক্ষণ পুলিশ ছিল সম্পূর্ণ দর্শকের ভূমিকায়। হিন্দু পাড়া এবং হিন্দুদের দোকানগুলিতে জেহাদি আক্রমণের সময় পুলিশ আগাগোড়া নিষ্ক্রিয় ছিল। মোথাবাড়ির কুড়িয়াটা অঞ্চলের মণ্ডলপাড়া, পালপাড়া, চৌধুরীপাড়া, তাঁতিপাড়া, বাজারপাড়া, রায়পাড়া, মাহিষ্যপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, হালদারপাড়া, লক্ষ্মণ কবিরাজ টোলা, বন্ধুপল্লী গ্রামগুলি জেহাদি সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান ও বাড়ির সংখ্যা শতাধিক। সাধারণ হিন্দুদের উপর জেহাদি দুষ্কৃতীরা বিনা প্ররোচনায় হামলা চালায়। এমনকী ওই হিংস্র জেহাদিরা ফেসবুক লাইভ করে বলে যে, পুলিশ তাদের উপর গুলি চালাবে না। পূর্বপরিকল্পিত এই আক্রমণ হলো শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপনের আগে হিন্দুসমাজের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা। গত ৫ আগস্ট পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশে সৃষ্টি হওয়া জেহাদি অরাজকতা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। জেহাদি হিংসা আটকাতে এবং হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য বুদ্ধদেব মণ্ডলের পিতৃদেব মদনমোহন মণ্ডল গত ২৮ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা মহকুমার খেয়ালী গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি-নাতনি এবং সবার প্রিয় পিসিমাকে রেখে গেছেন।

* * *

কাঁথির স্বয়ংসেবক বিশিষ্ট আইনজীবী তথা স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি আশিস কুমার রায় গত ১৮ মার্চ পথদুর্ঘটনায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি তাঁর মা-বাবা, দাদা, দিদি, স্ত্রী ও ২ কন্যা রেখে গেছেন। একসময় তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে অধিবক্তা পরিষদের সাংগঠনিক কাঁথি জেলার সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

* * *

মালদা জেলার কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, গোলাপগঞ্জ ও মোথাবাড়ি খণ্ড শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ বিপ্লব গুপ্তের মা অঞ্জলি গুপ্ত গত ৩১ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ১ কন্যা, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ বীরভূম জেলার সঙ্ঘাব প্রমুখ প্রণব কুমার ঘোষের পিতৃদেব সন্তোষ কুমার ঘোষ গত ৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৩ পুত্র ও নাতি- নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ বীরভূম জেলার কাঁখরতলা খণ্ডের সহ খণ্ড কার্যবাহ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায় গত ৭ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

বোমা বিস্ফোরণ

১৯০৯ সালের কোনো এক সময়ের ঘটনা। হঠাৎ একদিন রামপায়লী থানার কাছে রাত ৯টার সময় বিকট আওয়াজে বোমা বিস্ফোরণ ঘটল। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই হইচই পড়ে গেল, কে বা কারা এই বিস্ফোরণ ঘটালো পুলিশ কিছুতেই তার হদিস করতে পারলো না। তদন্তে দেখা গেল বোমাটি একটি নারকেলের খোলের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে। বিশাল বিস্ফোরক দ্রব্য না থাকলেও বোঝাই যাচ্ছিল এ ছিল বোমা তৈরির পরীক্ষামূলক কাজ। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কেউ বুঝতে পারলো যে এটা ছিল এককভাবে কেশব হেডগেওয়ারের কাজ।

কিশোর বয়সে নানাবিধ স্বদেশী কাজে নিজেকে যুক্ত করে স্বদেশব্রতে প্রেরণা লাভের ফল ছিল এটা। পতাকা জয়ের খেলা, সভাসমিতিতে শোভাযাত্রায় যোগদান, মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ ইত্যাদি দেখে দাদা মহাদেব শাস্ত্রী যখন এসব কাজ থেকে তাকে বলপূর্বক সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয় বড়োদাদার স্বেচ্ছাচারিতায় মাথা নীচু করে না থেকে, কষ্ট করে পড়াশোনা ও দেশসেবার কাজ করাই ভালো।

কেশব ও সমবয়সি তরুণরা মিলে ডাঃ মানখোজীর বিপ্লবী গোষ্ঠী 'স্বদেশ বান্ধব'-এর আলোচনাচক্রে যোগদান করতে লাগলো। বক্তৃতা দেওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে থাকলো। 'স্বদেশ-বান্ধব' সংগঠনের মাধ্যমে স্বদেশী বস্তুর প্রচার করার কাজে লেগে পড়লো তারা। 'আর্যবান্ধব বীথিকা' নামে তৈরি স্বদেশি সামগ্রীর বিপণীতে সাবান, বোতাম, কাগজ, খাম ইত্যাদি বিক্রিতে কেশবও সময় দিত।

১৯০৫-০৬ সালের দিকে নির্বাচিত কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে ডাঃ মুঞ্জের বাড়িতে (যিনি বুয়োর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নিজেকে পুরোপুরি স্বদেশের কাজে সঁপে দিয়েছিলেন।) একটি গুপ্ত বৈঠক হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনানুসারে সেই বৈঠকে মহারাষ্ট্র ও বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের কাজকর্মের যেমন বর্ণনা হয়, তেমনি অত্যন্ত সতর্কভাবে বোমা তৈরির পদ্ধতি তাদের শেখানো হয়। এই গুপ্ত সমিতির বৈঠকে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে কেশবও উপস্থিত ছিল। রামপায়লীর বোমা বিস্ফোরণ ছিল বোধহয় এই প্রশিক্ষণেরই ফল।

স্বাদেশিকতা ও বিপ্লবী সঙ্ঘ

পরীক্ষা শেষ হলে সবাই একটু খেলাধুলা, ঘোরাফেরা, ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে চায়। তাছাড়া প্রবেশিকা পরীক্ষা বলে কথা! এত বড়ো চাপ থেকে মুক্ত হয়ে খোলামেলা, একটু বাঁধনহারা পরিবেশ খোঁজা তো স্বাভাবিক। পরীক্ষান্তে সব ছেলে বাড়ি ফিরে সেই আনন্দ জোগাড়ের কাজেই লেগে গেল। কিন্তু কেশবের আনন্দ তো ভিন্ন কাজে— সময়টুকু দেশের কাজের জন্য কী করে লাগানো যায় সে নানান সর্বজনীন কাজে যোগদান করা শুরু করল। নাগপুর থেকে কিছু দূরে রামটেকে রামনবমী উপলক্ষ্যে বেশ বড়ো মেলা হতো। এই মেলার বিখ্যাত মিষ্টি প্যাঁড়ার খুব চাহিদা ছিল। কিন্তু মিষ্টি তৈরির চিনি আসতো জাভা থেকে। কেশব উদ্যোগ নিল কীভাবে গুড় দিয়ে স্বদেশী প্যাঁড়া তৈরি করা যায়। তাঁর চেষ্টায় তৈরি হলো পর্যাপ্ত পরিমাণে গুড়ের প্যাঁড়া, দামও কম। সকলে এই স্বদেশী প্যাঁড়ার স্বাদে মজে উঠল।

কিন্তু এটুকু করলে তো হবে না, স্থানীয় বিপ্লবী তরুণদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত, গুপ্ত বৈঠকে যোগদান তাঁর প্রধান কর্ম হয়ে দাঁড়ালো। এর ফলে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা বিভিন্ন বিপ্লবী তরুণদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হতেন, সারাদেশে বিপ্লবের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এই সময় মাধবদাস সন্ন্যাসী নামে এক বাঙ্গালি বিপ্লবী নাগপুরে আসেন। বিপ্লবী দলের নির্দেশে তার জাপান যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পূর্ণ যোজনা তৈরি ও অর্থসংগ্রহের জন্য তাকে কিছুদিন লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল। কেশব নিজে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং সন্তর্পণে মোহপার শ্রী আপ্পাজী হলদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো। বয়সে বড়ো হলেও বিপ্লবী মাধব দাস কেশবকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন কেশবরাওয়ের একজন অন্যতম গুণগ্রাহী। তারপর একদিন বিপ্লবী দলের নির্দেশে তাকে পরিকল্পনা মতো পাঠিয়ে দেওয়া হলো জাপান।

(সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস)